শারদোৎসব

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়

২ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট । কলিকাতা

পাত্রগণ

সন্ন্যাসী

ঠাকুরদাদা

লক্ষেশ্বর

উপনন্দ

রাজা

রাজদূত

অমাত্য

বালকগণ

রাগিণী ভৈরবী। তাল তেওরা

আজ বুকের বসন ছিঁড়ে ফেলে
দাঁড়িয়েছে এই প্রভাতখানি,
আকাশেতে সোনার আলোয়
ছড়িয়ে গেল তাহার বাণী।

ওরে মন, খুলে দে মন,
যা আছে তোর খুলে দে।
অন্তরে যা ডুবে আছে
আলোক-পানে তুলে দে।

আনন্দে সব বাধা টুটে
সবার সাথে ওঠ্‌ রে ফুটে,
চোখের 'পরে আলস-ভরে
রাখিস নে আর আঁচল টানি।

গ্রন্থপরিচয়

শারদোৎসব ১৩১৫ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। 'এই নাটিকাটি বোলপুর-ব্রহ্মচর্যাশ্রমের শারদোৎসব উপলক্ষে ছাত্রদের দ্বারা অভিনীত হইবার জন্য রচিত হয়।' ১৩২৬ সালে শান্তিনিকেতন আশ্রমে শারদোৎসব অভিনয় উপলক্ষে কবি এই নাটকের 'ভিতরের কথাটি' শান্তিনিকেতন পত্রে (১৩২৬ আশ্বিন ও কার্তিক) মুদ্রিত একটি প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করেন—

আগামী ছুটির পূর্বরাত্রে আশ্রমে শারদোৎসব অভিনয়ের প্রস্তাব হইয়াছে। তাহার আয়োজনও চলিতেছে। শারদোৎসব নাটকটি বিশেষভাবে ছেলেদের উপযোগী করিয়াই তৈরি হইয়াছিল: তাহার বাহিরের ধারাটি ছেলেদের বুঝিবার পক্ষে কঠিন নহে, কেবল তাহার ভিতরের কথাটি হয়তো ছেলেরা ঠিক বোঝে না।

সমস্ত নাটককে ব্যাপ্ত করিয়া যে ভাবটা আছে সেটা আমাদের আশ্রমের বালকদের পক্ষে সহজ। বিশেষ বিশেষ ফুলে ফলে হাওয়ায় আলোকে আকাশে পৃথিবীতে বিশেষ বিশেষ ঋতুর উৎসব চলিতেছে। সেই উৎসব মানুষ যদি অন্যমনস্ক হইয়া অন্তরের মধ্যে গ্রহণ না করে তবে সে পার্থিব জীবনের একটি বিশুদ্ধ এবং মহৎ আনন্দ হইতে বঞ্চিত হয়। মানুষের সঙ্গে মানুষের নানা কাজে নানা খেলায় মিলনের নানা উপলক্ষ আছে। মিলন ঠিকমতো ঘটিলেই,

অর্থাৎ তাহা কেবলমাত্র হাটের মেলা বাটের মেলা না হইলে, সেই মিলন নিজেকে কোনো না কোনো উৎসব-আকারে প্রকাশ করে। আমরা এই সংখ্যায় শান্তিনিকেতনে অন্য প্রবন্ধে বলিয়াছি, মিলন যেখানেই ঘটে, অর্থাৎ বহুর ভিতরকার মূল ঐক্যটি যেখানেই ধরা পড়ে, যাহারা বাহিরে পৃথক বলিয়া প্রতীয়মান তাহাদের অন্তরের নিত্য সম্বন্ধ যেখানেই উপলব্ধ হয়, সেখানেই সৃষ্টির অহেতুক অনির্বচনীয় লীলা প্রকাশ পায়। বহুর বিচিত্র ঐক্যসম্বন্ধই সৃষ্টি। মানুষ যেখানে বিচ্ছিন্ন সেখানে তাহার সৃজনকার্য দুর্বল। সভ্যতা শব্দের অর্থই এই, মানুষের মিলনজাত একটি বৃহৎ জগৎ; এই জগতে ঘরবাড়ি রাস্তাঘাট বিধিব্যবস্থা ধর্মকর্ম শিল্পসাহিত্য আমোদ-আহ্লাদ সমস্তই একটি বিরাট সৃষ্টি, এই সৃজনের মূলশক্তি মানুষের সত্য সম্বন্ধ। মানুষ যেখানে বিচ্ছিন্ন, যেখানে বিরুদ্ধ, সেখানে তাহার সৃজনকার্য নিস্তেজ। সেখানে সে কেবল কলে-চালানো পুতুলের মতো চিরাভ্যাসের পুনরাবৃত্তি করিয়া চলে, আপন জ্ঞান প্রাণ প্রেমকে নব নব আকারে প্রকাশ করে না। মিলনের শক্তিই সৃজনের শক্তি।

মানুষ যদি কেবলমাত্র মানুষের মধ্যেই জন্মগ্রহণ করিত তবে লোকালয়ই মানুষের একমাত্র মিলনের ক্ষেত্র হইত। কিন্তু মানুষের জন্ম তো কেবল লোকালয়ে নহে, এই বিশাল বিশ্বে তাহার জন্ম। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে তাহার প্রাণের গভীর সম্বন্ধ আছে। তাহার ইন্দ্রিয়বোধের তারে তারে প্রতি মুহূর্তে বিশ্বের স্পন্দন নানা রূপে রসে জাগিয়া উঠিতেছে।

বিশ্বপ্রকৃতির কাজ আমাদের প্রাণের মহলে আপনিই চলিতেছে,

কিন্তু মানুষের প্রধান সৃজনের ক্ষেত্র তাহার চিত্তমহলে। এই মহলে যদি দ্বার খুলিয়া আমরা বিশ্বকে আহ্বান করিয়া না লই, তবে বিরাটের সঙ্গে আমাদের পূর্ণ মিলন ঘটে না। বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে আমাদের চিত্তের মিলনের অভাব আমাদের মানবপ্রকৃতির পক্ষে একটা প্রকাণ্ড অভাব।

যে মানুষের মধ্যে সেই মিলন বাধা পায় নাই, সেই মানুষের জীবনের তারে তারে প্রকৃতির গান কেমন করিয়া বাজে, ইংরেজ কবি ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ্‌ *Three Years She Grew* নামক কবিতায় অপূর্ব সুন্দর করিয়া বলিয়াছেন। প্রকৃতির সহিত অবাধ মিলনে 'ল্যুসি'র দেহমন কী অপরূপ সৌন্দর্যে গড়িয়া উঠিবে তাহারই বর্ণনা উপলক্ষে কবি লিখিতেছেন, 'প্রকৃতির নির্বাক্‌ ও নিশ্চেতন পদার্থের যে নিরাময় শান্তি ও নিঃশব্দতা তাহাই এই বালিকার মধ্যে নিশ্বসিত হইবে। ভাসমান মেঘসকলের মহিমা তাহারই জন্য, এবং তাহারই জন্য উইলো বৃক্ষের অবনম্রতা। ঝড়ের গতির মধ্যে যে-একটি শ্রী তাহার কাছে প্রকাশিত তাহারই নীরব আত্মীয়তা আপন অবাধ ভঙ্গীতে এই কুমারীর দেহখানি গড়িয়া তুলিবে। নিশীথরাত্রির তারাগুলি হইবে তাহার ভালোবাসার ধন। আর, যে-সকল নিভৃতনিলয়ে নির্ঝরিণীগুলি বাঁকে বাঁকে উচ্ছলিত হইয়া নাচিয়া চলে সেইখানে কান পাতিয়া থাকিতে থাকিতে কলধ্বনির মাধুর্যটি তাহার মুখশ্রীর উপরে ধীরে সঞ্চারিত হইতে থাকিবে।'

পূর্বেই বলিয়াছি, ফুল-ফল-ফসলের মধ্যে প্রকৃতির সৃষ্টিকার্য কেবলমাত্র একমহলা; মানুষ যদি তাহার দুই মহলেই আপন সঞ্চয়কে পূর্ণ না করে তবে সেটা তাহার পক্ষে বড়ো লাভ নহে।

হৃদয়ের মধ্যে প্রকৃতির প্রবেশের বাধা অপসারিত করিলে তবেই প্রকৃতির সহিত তাহার মিলন সার্থক হয়, সুতরাং সেই মিলনেই তাহার প্রাণমন বিশেষ শক্তি বিশেষ পূর্ণতা লাভ করে।

মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনের উৎসব ঘরে ঘরে বারে বারে ঘটিতেছে। কিন্তু প্রকৃতির সভায় ঋতু-উৎসবের নিমন্ত্রণ যখন গ্রহণ করি তখন আমাদের মিলন আরও অনেক বড়ো হইয়া উঠে। তখন আমরা আকাশ-বাতাস গাছপালা পশুপক্ষী সকলের সঙ্গে মিলি—অর্থাৎ যে প্রকৃতির মধ্যে আমরা মানুষ তাহার সঙ্গে সত্য সম্বন্ধ আমরা অন্তরের মধ্যে স্বীকার করি। সেই স্বীকার করা কখনোই নিষ্ফল নহে। কারণ পূর্বেই বলিয়াছি, সম্বন্ধেই সৃষ্টির প্রকাশ। প্রকৃতির মধ্যে যখন কেবল আছি মাত্র তখন তাহা না থাকারই শামিল, কিন্তু প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের প্রাণমনের সম্বন্ধ-অনুভবেই আমরা সৃজনক্রিয়ার সঙ্গে সামঞ্জস্য লাভ করি ; চিত্তের দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখিলে আপনার মধ্যে এই সৃজনশক্তিকে কাজ করিবার বাধা দেওয়া হয়।

তাই নব ঋতুর অভ্যুদয়ে যখন সমস্ত জগৎ নূতন রঙের উত্তরীয় পরিয়া চারি দিক হইতে সাড়া দিতে থাকে তখন মানুষের হৃদয়কেও সে আহ্বান করে ; সেই হৃদয়ে যদি কোনো রঙ না লাগে, কোনো গান না জাগিয়া উঠে, তাহা হইলে মানুষ সমস্ত জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে।

সেই বিচ্ছেদ দূর করিবার জন্য আমাদের আশ্রমে আমরা প্রকৃতির ঋতু-উৎসবগুলিকে নিজেদের মধ্যে স্বীকার করিয়া লইয়াছি। শারদোৎসব সেই ঋতু-উৎসবেরই একটি নাটকের পালা।

নাটকের পাত্রগণের মধ্যে এই উৎসবের বাধা কে। লক্ষেশ্বর— সেই বণিক আপনার স্বার্থ লইয়া, টাকা উপার্জন লইয়া, সকলকে সন্দেহ করিয়া, ভয় করিয়া, ঈর্ষা করিয়া, সকলের কাছ হইতে আপনার সমস্ত সম্পদ গোপন করিয়া বেড়াইতেছে। এই উৎসবের পুরোহিত কে। সেই রাজা যিনি আপনাকে ভুলিয়া সকলের সঙ্গে মিলিতে বাহির হইয়াছেন, লক্ষ্মীর সৌন্দর্যের শতদল পদ্মটিকে যিনি চান। সেই পদ্ম যে চায় সোনাকে সে তুচ্ছ করে। লোভকে সে বিসর্জন দেয় বলিয়াই লাভ সহজ হইয়া সুন্দর হইয়া তাহার হাতে আপনি ধরা দেয়।

কিন্তু এই যে সুন্দরকে খুঁজিবার কথা বলা হইল, সে কী। সে কোথায়। সে কি একটা পেলব সামগ্রী, একটা শৌখিন পদার্থ। এই কথারই উত্তরটি এই নাটকের মাঝখানে রহিয়াছে।

শারদোৎসবের ছুটির মাঝখানে বসিয়া উপনন্দ তার প্রভুর ঋণ শোধ করিতেছে। রাজসন্ন্যাসী এই প্রেমঋণ-পরিশোধের, এই অক্লান্ত আত্মোৎসর্গের সৌন্দর্যটি দেখিতে পাইলেন। তাঁর তখনই মনে হইল, শারদোৎসবের মূল অর্থটি এই ঋণশোধের সৌন্দর্য। শরতে এই যে নদী ভরিয়া উঠিল কূলে কূলে, এই যে খেত ভরিয়া উঠিল শস্যের ভারে, ইহার মধ্যে একটি ভাব আছে, সে এই— প্রকৃতি আপনার ভিতরে যে অমৃতশক্তি পাইয়াছে সেইটাকে বাহিরে নানা রূপে নানা রসে শোধ করিয়া দিতেছে। সেই শোধ করাটাই প্রকাশ। প্রকাশ যেখানে সম্পূর্ণ হয় সেইখানেই ভিতরের ঋণ বাহিরে ভালো করিয়া শোধ করা হয়; সেই শোধের মধ্যেই সৌন্দর্য।

দেবতা আপনাকেই কি মানুষের মধ্যে দেন নাই। সেই দানকে যখন অক্লান্ত তপস্যার অকৃপণ ত্যাগের দ্বারা মানুষ শোধ

করিতে থাকে তখনই দেবতা তাহার মধ্য হইতে আপনার দান অর্থাৎ আপনাকে নূতন আকারে ফিরিয়া পান, আর তখনই কি তাহার মনুষ্যত্ব সম্পূর্ণ হইয়া উঠে না। সেই প্রকাশ যতই বাধা কাটাইয়া উঠিতে থাকে ততই কি তাহা সুন্দর, তাহা উজ্জ্বল হয় না। বাধা কোথায় কাটে না। যেখানে আলস্য, যেখানে বীর্যহীনতা, যেখানে আত্মাবমাননা। যেখানে মানুষ জ্ঞানে প্রেমে কর্মে দেবতা হইয়া উঠিতে সর্বপ্রযত্নে প্রয়াস না পায় সেখানে নিজের মধ্যে সে দেবত্বের ঋণ অস্বীকার করে। যেখানে ধনকে সে আঁকড়িয়া থাকে, স্বার্থকেই চরম আশ্রয় বলিয়া মনে করে, সেখানে দেবতার ঋণকে সে নিজের ভোগে লাগাইয়া একেবারে ফুঁকিয়া দিতে চায়; তাহাকে যে অমৃত দেওয়া হইয়াছিল, সে অমৃতের উপলব্ধিতে সে মৃত্যুকে তুচ্ছ করিতে পারে, ক্ষতিকে অবজ্ঞা করিতে পারে, দুঃখকে গলার হার করিয়া লয়, জীবনের প্রকাশের মধ্য দিয়া সেই অমৃতকে তখন সে শোধ করিয়া দেয় না। বিশ্বপ্রকৃতিতে ও মানবপ্রকৃতিতে এই অমৃতের প্রকাশকেই বলে সৌন্দর্য; আনন্দরূপমমৃতম্।

রাজসন্ন্যাসী উপনন্দকে দেখাইয়া দিয়া বলিয়াছেন, এই ঋণ-শোধেই যথার্থ ছুটি, যথার্থ মুক্তি। নিজের মধ্যে অমৃতের প্রকাশ যতই সম্পূর্ণ হইতে থাকে ততই বন্ধন মোচন হয়, কর্মকে এড়াইয়া তপস্যায় ফাঁকি দিয়া পরিত্রাণ লাভ হয় না। তাই তিনি উপনন্দকে বলিয়াছেন, 'তুমি পংক্তির পর পংক্তি লিখছ আর ছুটির পর ছুটি পাচ্ছ।'

এই লইয়া সন্ন্যাসীতে ঠাকুরদাদাতে যে কথাবার্তা হইয়াছে নীচে তাহা উদ্ধৃত করিলাম—

সন্ন্যাসী। আমি অনেকদিন ভেবেছি জগৎ এমন আশ্চর্য সুন্দর কেন?... আজ স্পষ্ট প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছি— জগৎ আনন্দের ঋণ শোধ করছে। বড়ো সহজে করছে না, নিজের সমস্ত শক্তি দিয়ে সমস্ত ত্যাগ ক'রে করছে।... কোথাও সাধনার এতটুকু বিশ্রাম নেই, সেইজন্যই এত সৌন্দর্য।

ঠাকুরদাদা। এ কদিকে অনন্ত ভাণ্ডার থেকে তিনি কেবলই ঢেলে দিচ্ছেন, আর-এক দিকে কঠিন দুঃখে তারই শোধ চলছে।... এই দুঃখের জোরেই পাওয়ার সঙ্গে দেওয়ার ওজন বেশ সমান থেকে যাচ্ছে, মিলনটি সুন্দর হয়ে উঠেছে।

সন্ন্যাসী। ঠাকুরদা, যেখানে আলস্য, যেখানে কৃপণতা, যেখানেই ঋণশোধে ঢিল পড়ে যাচ্ছে, সেইখানেই সমস্ত কুশ্রী...।

ঠাকুরদাদা। সেইখানেই যে এক পক্ষে কম পড়ে যায়, অন্য পক্ষের সঙ্গে মিলন পুরো হতে পায় না।

সন্ন্যাসী। লক্ষ্মী যখন মানবের মর্ত্যলোকে আসেন তখন দুঃখিনী হয়েই আসেন; তাঁর সেই সাধনার তপস্বিনীবেশেই ভগবান মুগ্ধ...; শত দুঃখেরই দলে তাঁর সোনার পদ্ম সংসারে ফুটে উঠেছে...।

লক্ষ্মী সৌন্দর্য ও সম্পদের দেবী; গৌরী যেমন তপস্যা করিয়া শিবকে পাইয়াছিলেন, মর্ত্যলোকে লক্ষ্মীও তেমনি দুঃখের সাধনার দ্বারাই ভগবানের সহিত মিলন লাভ করেন। যে-মানুষ বা যে-জাতির মধ্যে এই ত্যাগ নাই তপস্যা নাই, দুঃখস্বীকারে জড়তা, সেখানে লক্ষ্মী নাই, সুতরাং সেখানে ভগবানের প্রেম আকৃষ্ট হয় না।

উপনন্দ তাহার প্রভুর নিকট হইতে প্রেম পাইয়াছিল, ত্যাগ-স্বীকারের দ্বারা প্রতিদানের পথ বাহিয়া সে যতই সেই প্রেমদানের সমান ক্ষেত্রে উঠিতেছে ততই সে মুক্তির আনন্দ উপলব্ধি করিতেছে।

দুঃখই তাহাকে এই আনন্দের অধিকারী করে। ঋণের সহিত ঋণশোধের বৈষম্যই বন্ধন এবং তাহাই কুশ্রীতা।

শারদোৎসবের 'ভিতরকার ধুয়ো' সম্বন্ধে "আমার ধর্ম" প্রবন্ধে কবি লিখিয়াছেন :

শারদোৎসব থেকে আরম্ভ করে ফাল্গুনী পর্যন্ত যতগুলি নাটক লিখেছি, যখন বিশেষ করে মন দিয়ে দেখি তখন দেখতে পাই প্রত্যেকের ভিতরকার ধুয়োটা ওই একই। রাজা বেরিয়েছেন সকলের সঙ্গে মিলে শারদোৎসব করবার জন্যে। তিনি খুঁজছেন তার সাথী। পথে দেখলেন ছেলেরা শরৎপ্রকৃতির আনন্দে যোগ দেবার জন্যে উৎসব করতে বেরিয়েছে। কিন্তু একটি ছেলে ছিল— উপনন্দ— সমস্ত খেলাধুলো ছেড়ে সে তার প্রভুর ঋণ শোধ করবার জন্যে নিভৃতে বসে একমনে কাজ করছিল। রাজা বললেন, তার সত্যকার সাথী মিলেছে, কেননা ওই ছেলেটির সঙ্গেই শরৎপ্রকৃতির সত্যকার আনন্দের যোগ— ওই ছেলেটি দুঃখের সাধনা দিয়ে আনন্দের ঋণ শোধ করছে— সেই দুঃখেরই রূপ মধুরতম। বিশ্বই যে এই দুঃখ-তপস্যায় রত; অসীমের যে-দান সে নিজের মধ্যে পেয়েছে, অশ্রান্ত প্রয়াসের বেদনা দিয়ে সেই দানের সে শোধ করছে। প্রত্যেক ঘাসটি নিরলস চেষ্টার দ্বারা আপনাকে প্রকাশ করছে, এই প্রকাশ করতে গিয়েই সে আপন অন্তর্নিহিত সত্যের ঋণ শোধ করছে। এই যে নিরন্তর বেদনায় তার আত্মোৎসর্জন, এই দুঃখই তো তার শ্রী, এই তো তার উৎসব, এতেই তো সে

শরৎপ্রকৃতিকে সুন্দর করেছে, আনন্দময় করেছে। বাইরে থেকে দেখলে একে খেলা মনে হয় কিন্তু এ তো খেলা নয়, এর মধ্যে লেশমাত্র বিরাম নেই। যেখানে আপন সত্যের ঋণশোধে শৈথিল্য, সেখানেই প্রকাশে বাধা, সেইখানেই কদর্যতা, সেইখানেই নিরানন্দ। আত্মার প্রকাশ আনন্দময়, এইজন্যেই সে দুঃখকে মৃত্যুকে স্বীকার করতে পারে— ভয়ে কিংবা আলস্যে কিংবা সংশয়ে এই দুঃখের পথকে যে লোক এড়িয়ে চলে জগতে সেইই আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়। শারদোৎসবের ভিতরকার কথাটাই এই— ও তো গাছতলায় বসে বসে বাঁশির সুর শোনবার কথা নয়।

ভানুসিংহের পত্রাবলীতে প্রকাশিত একটি চিঠিতে (২৪ ভাদ্র ১৩২৯) কবি শারদোৎসব সম্বন্ধে লিখিতেছেন :

ওটা হচ্ছে ছুটির নাটক। ওর সময়ও ছুটির, ওর বিষয়ও ছুটির। রাজা ছুটি নিয়েছে রাজত্ব থেকে, ছেলেরা ছুটি নিয়েছে পাঠশালা থেকে। তাদের আর কোনো মহৎ উদ্দেশ্য নেই, কেবল একমাত্র হচ্ছে— 'বিনা কাজে বাজিয়ে বাঁশি কাটবে সকল বেলা।' ওর মধ্যে একটা উপনন্দ কাজ করছে, কিন্তু সেও তার ঋণ থেকে ছুটি পাবার কাজ।

১৩২৯ সালে কলিকাতায় শারদোৎসব অভিনয়ের সময় উহার একটি "ভূমিকা" কবি রচনা করেন। অভিনয়-পত্রী হইতে তাহা নীচে মুদ্রিত হইল :

রাজা। আমাদের সব প্রস্তুত তো?

মন্ত্রী। হাঁ মহারাজ, একরকম প্রস্তুত, কিন্তু—

রাজা। কিন্তু! কিন্তু আবার কিসের। আমাদের শারদ-উৎসবের ভিতরেও কিন্তু এসে পড়ে! এ তো রাষ্ট্রনীতি নয়।

মন্ত্রী। উৎসবের আয়োজনের মধ্যে একটি কবি আছেন যে, কাজেই কিন্তুর অভাব হয় না।

রাজা। আমাদের কবিশেখরের কথা বলছ? তা তাঁর উপরে তো ভার ছিল উৎসব উপলক্ষে একটা যাত্রার পালা তৈরি করবার জন্যে।

মন্ত্রী। আপনি তো তাঁকে জানেন, সুবিধা-অসুবিধা, স্থান-কাল-পাত্র এ-সবের দিকে তাঁর একেবারেই দৃষ্টি নেই। তিনি আপন খেয়ালমতোই চলেন।

রাজা। তা হয়েছে কী। লোকটা পালিয়েছে নাকি?

মন্ত্রী। একরকম পালানোই বইকি। সভাপণ্ডিত-মশায় ঠিক করে দিয়েছিলেন, এবারকার উৎসবের জন্যে শুম্ভ-নিশুম্ভ-বধের পালা তৈরি করে দিতে হবে। এ কথা হয়েছিল সেই মহাদ্বাদশীর দিনে। কাল শুনি কবি সে পালা তৈরিই করে নি।

রাজা। কী সর্বনাশ। এ মানুষকে নিয়ে দেখছি আর চলল না। সখা, তুমি কেনারাম পাঁচালিওয়ালার উপর ভার দিলে না কেন— তা হলে তো এ বিভ্রাট ঘটত না। পুরবাসীরা সবাই এসে জুটেছেন, এখন উপায়?

মন্ত্রী। কবি বলছেন, তিনি তাঁর মনের মতো ছোটো একটা পালা লিখেছেন।

রাজা। তাতে আছে কী।

মন্ত্রী। তা তো বলতে পারি নে। সংক্ষেপে যা বর্ণনা করলেন তাতে ভাবটা কিছুই বুঝতে পারলেম না। বললেন যে, সেটা গানেতে গন্ধেতে রঙেতে রসেতে মিশিয়ে একটা কিছুই-না গোছের জিনিস।

রাজা। কিছুই-না গোছের জিনিস! এ কি পরিহাস, না কি?

মন্ত্রী। শুধু পরিহাস নয়, মহারাজ, এ দুর্দৈব।

রাজা। তাতে গল্প কিছু আছে?

মন্ত্রী। নেই বললেই হয়!

রাজা। যুদ্ধ?

মন্ত্রী। না।

রাজা। কোনোরকমের রক্তপাত?

মন্ত্রী। না।

রাজা। আত্মহত্যা? পতন ও মূর্ছা?

মন্ত্রী। একেবারেই না।

রাজা। আদিরস? বীররস? করুণরস?

মন্ত্রী। না, কোনোটাই না। কবি বলেন, তিনি যা রচনা করেছেন তা শরৎকালের উপযোগী খুব হালকা রকমের ব্যাপার। তার মধ্যে ভার একটুও নেই।

রাজা। তাকে শরৎকালের উপযোগী বলবার মানে কী হল?

মন্ত্রী। কবি বলেন, শরৎকালের মেঘ যে হালকা, তার কোনো প্রয়োজন নেই, তার জলভার নেই, সে নিঃসম্বল সন্ন্যাসী।

রাজা। এ কথা সত্য বটে।

মন্ত্রী। কবি বলেন, শরৎকালের শিউলিফুলের মধ্যে যেন কোনো আসক্তি নেই, যেমন সে ফোটে তেমনি সে ঝরে পড়ে।

রাজা। এ কথা মানতে হয়।

মন্ত্রী। কবি বলেন, শরৎকালের কাশের স্তবক না বাগানের না বনের ; সে হেলাফেলার মাঠে ঘাটে নিজের অকিঞ্চনতার ঐশ্বর্য বিস্তার করে বেড়াচ্ছে। সে সন্ন্যাসী।

রাজা। এ কথা কবি বেশ বলেছে।

মন্ত্রী। কবি বলেন, শরতের কাঁচাধানের যে খেত দেখি, কেবল আছে তার রঙ, কেবল আছে তার দোলা। আর কোনো দায় যদি তার থাকে সে কথা সে একেবারে লুকিয়েছে।

রাজা। ঠিক কথা।

মন্ত্রী। তাই কবি বলেন, তাঁর শারদোৎসবের যে পালা সে ওইরকমই হালকা, ওইরকমই নিরর্থক। সে-পালায় কাজের কথা নেই, সে-পালায় আছে ছুটির খুশি।

রাজা। বাঃ, এ তো মন্দ শোনাচ্ছে না। ওর মধ্যে রাজা কেউ আছে ?

মন্ত্রী। একজন আছেন। কিন্তু তিনি কিছুদিনের জন্যে রাজত্ব থেকে ছুটি নিয়ে সন্ন্যাসীবেশে মাঠে ঘাটে বিনা কাজে দিন কাটিয়ে বেড়াচ্ছেন।

রাজা। বাঃ বাঃ, শুনে লোভ হয় যে! আর কে আছে ?

মন্ত্রী। আর আছে সব ছেলের দল।

রাজা। ছেলের দল ? তাদের নিয়ে কী হবে ?

মন্ত্রী। কবি বলেন, ওই ছেলেদের প্রাণের মধ্যেই তো আসল ছুটির চেহারা। তারা কাঁচাধানের খেতের মতোই নিজে না জেনে, কাউকে না জানিয়ে ছুটির ভিতরেই, ফসলের আয়োজন করছে।

রাজা। তা ওই ছেলের দলকে ভালো করে শেখানো হয়েছে?

মন্ত্রী। একেবারেই না।

রাজা। কী সর্বনাশ! তা হলে—

মন্ত্রী। কবি বলেন, বুড়োরা ছেলেদের যদি শেখাতে যায়, তা হলে তো ছেলেরা পেকে যাবে— ছেলেই থাকবে না। সেইজন্যে ওদের নাট্য শেখানোই হয় নি। কবি বলেন, সহজে খুশি হবার বিদ্যে ওদের কাছ থেকে আমরাই শিখব।

রাজা। কিন্তু মন্ত্রী, সহজে খুশি হবার বিদ্যা তো পুরবাসীদের বিদ্যা নয়। এই-সব হালকা, এই-সব কাঁচা, এই-সব না-শেখা ব্যাপারের মূল্য কি তাঁদের কাছে আছে?

মন্ত্রী। সে কথা আমি কবিকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম— তিনি বললেন, ওজন যার কিছু নেই তার আবার মূল্য কিসের? হেমন্তের পাকা ধানেরই মূল্য আছে, ভাদ্রের কাঁচা খেতের আবার মূল্য কী। একটুখানি হাসি, একটুখানি খুশি, এই হলেই দেনাপাওনা চুকে যাবে।

রাজা। আচ্ছা বেশ, শুম্ভ-নিশুম্ভ তা হলে এখন থাক্— আসুক ছেলের দল, আসুক সন্ন্যাসীবেশে রাজা। তা হলে কবিকে একবার ডেকে দাও-না, তার সঙ্গে একবার কথা কয়ে নিই।

মন্ত্রী। তাঁকে ডাকব কী মহারাজ, তিনি নিজেই যে এই পালায় সাজছেন।

রাজা। বল কী, তার শিক্ষা হল কোথায় ?

মন্ত্রী। তার শিক্ষা হয়ই নি।

রাজা। তবে ? সে কি হাত-পা নেড়ে গলা ছেড়ে দিয়ে আসর জমাতে পারবে ? সে যে আনাড়ি।

মন্ত্রী। পাছে যারা হাত-পা নাড়তে শিক্ষা পেয়েছে তাদের ডাকা হয় এই ভয়েই সে নিজেই সন্ন্যাসী সাজবার ভার নিয়েছে। সে বলে, পালার বিষয়টা যেমন অনর্থক পালার নটের দলও তেমনি অশিক্ষিত।

রাজা। তা, এ নিয়ে এখন পরিতাপ করে কোনো লাভ নেই। তা হলে আরম্ভ করে দাও। একটা সুবিধে এই যে বেশি কিছু আশা করব না সুতরাং বেশি কিছু নৈরাশ্যের আশঙ্কা থাকবে না। গোড়ায় একটা গান হবে তো ?

মন্ত্রী। হবে বইকি। এই যে গানের দল আপনার পাশেই বসে।

শান্তিনিকেতনে শারদোৎসবের প্রথম অভিনয় (১৩১৫) উপলক্ষে কবি এই নাটকের জন্য একটি নান্দী রচনা করিয়াছিলেন (ভারতী, কার্তিক ১৩১৫)। উহা গ্রন্থে মুদ্রিত হয় নাই, নীচে সেটি উদ্ধৃত হইল :

শরতে হেমন্তে শীতে বসন্তে নিদাঘে বরষায়
অনন্ত সৌন্দর্যধারে যাঁহার আনন্দ বহি যায়
সেই অপরূপ, সেই অরূপ, রূপের নিকেতন
নব নব ঋতুরসে ভরে দিন সবাকার মন।

প্রফুল্ল শেফালিকুঞ্জ যাঁর পায়ে ঢালিছে অঞ্জলি,
কাশের মঞ্জরীরাশি যাঁর পানে উঠিছে চঞ্চলি',
স্বর্ণদীপ্তি আশ্বিনের স্নিগ্ধ হাস্যে সেই রসময়
নির্মল শারদরূপে কেড়ে নিন সবার হৃদয়।

শারদোৎসব নানা স্থানে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হইয়া, নূতন ভূমিকা ও চরিত্র সংবলিত হইয়া "ঋণশোধ" নাটক (১৯২১) প্রকাশিত হয়।

—

প্রথম দৃশ্য

পথে বালকগণ

গান

বিভাস। একতালা

মেঘের কোলে রোদ হেসেছে,
বাদল গেছে টুটি—
আজ আমাদের ছুটি ও ভাই,
আজ আমাদের ছুটি।
কী করি আজ ভেবে না পাই,
পথ হারিয়ে কোন্ বনে যাই,
কোন্ মাঠে যে ছুটে বেড়াই
সকল ছেলে জুটি।
কেয়াপাতার নৌকো গ'ড়ে
সাজিয়ে দেব ফুলে—
তালদিঘিতে ভাসিয়ে দেব,
চলবে দুলে দুলে।
রাখাল-ছেলের সঙ্গে ধেনু
চরাব আজ বাজিয়ে বেণু,
মাখব গায়ে ফুলের রেণু
চাঁপার বনে লুটি।

আজ আমাদের ছুটি ও ভাই,
আজ আমাদের ছুটি।

লক্ষেশ্বর

ঘর হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া

ছেলেগুলো তো জ্বালালে। ওরে চোবে, ওরে গিরধারী-লাল, ধর্ তো ছোঁড়াগুলোকে ধর্ তো।

ছেলেরা

দূরে ছুটিয়া গিয়া হাততালি দিয়া

ওরে লক্ষ্মীপেঁচা বেরিয়েছে রে লক্ষ্মীপেঁচা বেরিয়েছে।

লক্ষেশ্বর

হনুমন্ত সিং, ওদের কান পাকড়ে আন্ তো ; একটাকেও ছাড়িস নে।

একজন বালক

চুপি চুপি পশ্চাৎ হইতে আসিয়া কান হইতে
কলম টানিয়া লইয়া

কাক লেগেছে লক্ষ্মীপেঁচা,
লেজে ঠোকর খেয়ে চেঁচা।

লক্ষেশ্বর

হতভাগা, লক্ষ্মীছাড়া সব, আজ একটাকেও আস্ত রাখব না।

ঠাকুরদাদার প্রবেশ

ঠাকুরদাদা

কী হয়েছে লখাদাদা ! মার-মূর্তি কেন।

লক্ষেশ্বর

আরে দেখো-না ! সকাল বেলা কানের কাছে চেঁচাতে আরম্ভ করেছে।

ঠাকুরদাদা

আজ যে শরতে ওদের ছুটি, একটু আমোদ করবে না ! গান গাইলেও তোমার কানে খোঁচা মারে ! হায় রে হায়, ভগবান তোমাকে এত শাস্তিও দিচ্ছেন।

লক্ষেশ্বর

গান গাবার বুঝি সময় নেই ! আমার হিসাব লিখতে ভুল হয়ে যায় যে। আজ আমার সমস্ত দিনটাই মাটি করলে।

ঠাকুরদাদা

তা ঠিক। হিসেব ভুলিয়ে দেবার ওস্তাদ ওরা। ওদের সাড়া পেলে আমার বয়সের হিসাবে প্রায় পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন বছরের গরমিল হয়ে যায় ! ওরে বাঁদরগুলো, আয় তো রে, চল্ তোদের পঞ্চাননতলার মাঠটা ঘুরিয়ে আনি।

যাও দাদা, তোমার দপ্তর নিয়ে বসো গে। আর হিসেবে ভুল হবে না।

লক্ষেশ্বরের প্রস্থান

ঠাকুরদাদাকে ঘিরিয়া ছেলেদের নৃত্য

প্রথম

হাঁ ঠাকুরদাদা, চলো।

দ্বিতীয়

আমাদের আজ গল্প বলতে হবে।

তৃতীয়

না গল্প না, বটতলায় বসে আজ ঠাকুরদার পাঁচালি হবে।

চতুর্থ

বটতলায় না ঠাকুরদা, আজ পারুলডাঙায় চলো।

ঠাকুরদাদা

চুপ, চুপ, চুপ। অমন গোলমাল লাগাস যদি তো লখাদাদা আবার ছুটে আসবে।

লক্ষেশ্বরের পুনঃপ্রবেশ

লক্ষেশ্বর

কোন্ পোড়ার-মুখো আমার কলম নিয়েছে রে!

কলম ফেলিয়া দিয়া সকলের প্রস্থান

উপনন্দের প্রবেশ

লক্ষেশ্বর

কী রে, তোর প্রভু কিছু টাকা পাঠিয়ে দিলে? অনেক পাওনা বাকি।

উপনন্দ

কাল রাত্রে আমার প্রভুর মৃত্যু হয়েছে।

লক্ষেশ্বর

মৃত্যু! মৃত্যু হলে চলবে কেন। আমার টাকাগুলোর কী হবে।

উপনন্দ

তাঁর তো কিছুই নেই। যে বীণা বাজিয়ে উপার্জন ক'রে তোমার ঋণ শোধ করতেন সেই বীণাটি আছে মাত্র।

লক্ষেশ্বর

বীণাটি আছে মাত্র! কী শুভ সংবাদটাই দিলে।

উপনন্দ

আমি শুভ সংবাদ দিতে আসি নি। আমি একদিন পথের ভিক্ষুক ছিলেম, তিনিই আমাকে আশ্রয় দিয়ে তাঁর বহুদুঃখের অন্নের ভাগে আমাকে মানুষ করেছেন। তোমার কাছে দাসত্ব ক'রে আমি সেই মহাত্মার ঋণ শোধ করব।

লক্ষেশ্বর

বটে! তাই বুঝি তাঁর অভাবে আমার বহু দুঃখের

অন্নে ভাগ বসাবার মৎলব করেছ। আমি তত বড়ো গর্দভ নই। আচ্ছা, তুই কী করতে পারিস বল্‌ দেখি।

উপনন্দ

আমি চিত্রবিচিত্র ক'রে পুঁথি নকল করতে পারি।— তোমার অন্ন আমি চাই নে। আমি নিজে উপার্জন ক'রে যা পারি খাব, তোমার ঋণও শোধ করব।

লক্ষেশ্বর

আমাদের বীণকারটিও যেমন নির্বোধ ছিল ছেলেটাকেও দেখছি ঠিক তেমনি করেই বানিয়ে গেছে। হতভাগা ছোঁড়াটা পরের দায় ঘাড়ে নিয়েই মরবে। এক-একজনের ঐরকম মরাই স্বভাব।

আচ্ছা বেশ, মাসের ঠিক তিন তারিখের মধ্যেই নিয়ম-মতো টাকা দিতে হবে। নইলে—

উপনন্দ

নইলে আবার কী। আমাকে ভয় দেখাচ্ছ মিছে। আমার কী আছে যে তুমি আমার কিছু করবে। আমি আমার প্রভুকে স্মরণ করে ইচ্ছা করেই তোমার কাছে বন্ধন স্বীকার করেছি। আমাকে ভয় দেখিয়ো না বলছি।

লক্ষেশ্বর

না না, ভয় দেখাব না। তুমি লক্ষীছেলে, সোনার-চাঁদ ছেলে। টাকাটা ঠিকমতো দিয়ো বাবা। নইলে আমার ঘরে

দেবতা আছে, তার ভোগ কমিয়ে দিতে হবে—সেটাতে তোমারই পাপ হবে।

উপনন্দের প্রস্থান

ঐ যে, আমার ছেলেটা এইখানে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমি কোন্‌খানে টাকা পুঁতে রাখি ও নিশ্চয়ই সেই খোঁজে ফেরে। ওদেরই ভয়েই তো আমাকে এক সুরঙ্গ হতে আর-এক সুরঙ্গে টাকা বদল করে বেড়াতে হয়।

ধনপতি, এখানে কেন রে। তোর মৎলবটা কী বল্‌ দেখি।

ধনপতি

ছেলেরা আজ সকলেই বেতসিনীর ধারে আমোদ করতে গেছে— আমাকে ছুটি দিলে আমিও যাই।

লক্ষেশ্বর

বেতসিনীর ধারে! ঐ রে খবর পেয়েছে বুঝি।— বেতসিনীর ধারেই তো আমি সেই গজমোতির কৌটো পুঁতে রেখেছি।

ধনপতির প্রতি

না, না, খবরদার বলছি, সে-সব না। চল্‌ শীঘ্র চল্‌, নামতা মুখস্থ করতে হবে।

ধনপতি

নিশ্বাস ফেলিয়া

আজ এমন সুন্দর দিনটা!

লক্ষেশ্বর

দিন আবার সুন্দর কী রে! এইরকম বুদ্ধি মাথায় ঢুকলেই ছোঁড়াটা মরবে আর-কি। যা বলছি, ঘরে যা।

ধনপতির প্রস্থান

ভারী বিশ্রী দিন। আশ্বিনের এই রোদ্দুর দেখলে আমার সুদ্ধ মাথা খারাপ করে দেয়, কিছুতে কাজে মন দিতে পারি নে। মনে করছি মলয় দ্বীপে গিয়ে কিছু চন্দন জোগাড় করবার জন্যে বেরিয়ে পড়লে হয়। যাই হোক, সে পরে হবে, আপাতত বেতসিনীর ধারটায় একবার ঘুরে আসতে হচ্ছে। ছোঁড়াগুলো খবর পায় নি তো! ওদের যে ইঁদুরের স্বভাব। সব জিনিস খুঁড়ে বের করে ফেলে — কোনো জিনিসের মূল্য বোঝে না, কেবল কেটেকুটে ছার-খার করতেই ভালোবাসে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

বেতসিনীর তীর। বন

ঠাকুরদাদা ও বালকগণ

গান

বাউলের সুর

আজ ধানের খেতে রৌদ্রছায়ায়
লুকোচুরি খেলা।
নীল আকাশে কে ভাসালে
সাদা মেঘের ভেলা।

একজন বালক

ঠাকুরদা, তুমি আমাদের দলে।

দ্বিতীয় বালক

না ঠাকুরদা, সে হবে না, তুমি আমাদের দলে।

ঠাকুরদাদা

না ভাই, আমি ভাগাভাগির খেলায় নেই; সে সব হয়ে-বয়ে গেছে। আমি সকল দলের মাঝখানে থাকব, কাউকে বাদ দিতে পারব না। এবার গানটা ধর্।

আজ ভ্রমর ভোলে মধু খেতে,
উড়ে বেড়ায় আলোয় মেতে—
আজ কিসের তরে নদীর চরে
চখাচখির মেলা।

অন্ত দল আসিয়া

অন্য দল

ঠাকুরদা, এই বুঝি! আমাদের তুমি ডেকে আনলে না কেন। তোমার সঙ্গে আড়ি। জন্মের মতো আড়ি।

ঠাকুরদাদা

এত বড়ো দণ্ড! নিজেরা দোষ করে আমাকে শাস্তি! আমি তোদের ডেকে বের করব না তোরা আমাকে ডেকে বাইরে টেনে আনবি! না ভাই, আজ ঝগড়া না, গান ধর্।

ওরে যাব না আজ ঘরে রে ভাই,
যাব না আজ ঘরে।
ওরে আকাশ ভেঙে বাহিরকে আজ
নেব রে লুঠ করে।
যেন জোয়ার-জলে ফেনার রাশি
বাতাসে আজ ছুটছে হাসি,
আজ বিনা কাজে বাজিয়ে বাঁশি
কাটবে সকল বেলা।

প্রথম বালক

ঠাকুরদা, ঐ দেখো, ঐ দেখো, সন্ন্যাসী আসছে।

দ্বিতীয় বালক

বেশ হয়েছে, বেশ হয়েছে, আমরা সন্ন্যাসীকে নিয়ে খেলব।

আমরা সব চেলা সাজব।

তৃতীয় বালক

আমরা ওঁর সঙ্গে বেরিয়ে যাব, কোন্ দেশে চলে যাব কেউ খুঁজেও পাবে না।

ঠাকুরদাদা

আরে চুপ, চুপ!

সকলে

সন্ন্যাসীঠাকুর, সন্ন্যাসীঠাকুর!

ঠাকুরদাদা

আরে থাম্, থাম্! ঠাকুর রাগ করবে।

সন্ন্যাসীর প্রবেশ

বালকগণ

সন্ন্যাসীঠাকুর, তুমি কি আমাদের উপর রাগ করবে। আজ আমরা সব তোমার চেলা হব।

সন্ন্যাসী

হা হা হা হা! এ তো খুব ভালো কথা। তার পরে আবার

তোমরা সব শিশু-সন্ন্যাসী সেজো, আমি তোমাদের বুড়ো চেলা সাজব। এ বেশ খেলা, এ চমৎকার খেলা।

ঠাকুরদাদা

প্রণাম হই। আপনি কে।

সন্ন্যাসী

আমি ছাত্র।

ঠাকুরদাদা

আপনি ছাত্র!

সন্ন্যাসী

হাঁ, পুঁথিপত্র সব পোড়াবার জন্যে বের হয়েছি।

ঠাকুরদাদা

ও ঠাকুর, বুঝেছি। বিদ্যের বোঝা সমস্ত ঝেড়ে ফেলে দিব্যি একেবারে হাল্কা হয়ে সমুদ্রে পাড়ি দেবেন।

সন্ন্যাসী

চোখের পাতার উপরে পুঁথির পাতাগুলো আড়াল করে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে— সেইগুলো খসিয়ে ফেলতে চাই।

ঠাকুরদাদা

বেশ, বেশ, আমাকেও একটু পায়ের ধুলো দেবেন। প্রভু, আপনার নাম বোধ করি শুনেছি— আপনি তো স্বামী অপূর্বানন্দ?

ছেলেরা

সন্ন্যাসীঠাকুর, ঠাকুরদাদা কী মিথ্যে বকছেন। এমনি করে আমাদের ছুটি বয়ে যাবে।

সন্ন্যাসী

ঠিক বলেছ বৎস, আমারও ছুটি ফুরিয়ে আসছে।

ছেলেরা

তোমার কত দিনের ছুটি।

সন্ন্যাসী

খুব অল্প দিনের। আমার গুরুমশায় তাড়া করে বেরিয়েছেন, তিনি বেশি দূরে নেই, এলেন ব'লে।

ছেলেরা

ও বাবা, তোমারও গুরুমশায়!

প্রথম বালক

সন্ন্যাসীঠাকুর, চলো আমাদের যেখানে হয় নিয়ে চলো। তোমার যেখানে খুশি।

ঠাকুরদাদা

আমিও পিছনে আছি ঠাকুর, আমাকেও ভুলো না।

সন্ন্যাসী

আহা, ও ছেলেটি কে। গাছের তলায় এমন দিনে পুঁথির মধ্যে ডুবে রয়েছে।

বালকগণ

উপনন্দ।

প্রথম বালক

ভাই উপনন্দ, এসো ভাই। আমরা আজ সন্ন্যাসীঠাকুরের চেলা সেজেছি, তুমিও চলো আমাদের সঙ্গে। তুমি হবে সর্দার চেলা।

উপনন্দ

না ভাই, আমার কাজ আছে।

ছেলেরা

কিচ্ছু কাজ নেই, তুমি এসো।

উপনন্দ

আমার পুঁথি নকল করতে অনেকখানি বাকি আছে।

ছেলেরা

সে বুঝি কাজ! ভারী তো কাজ! ঠাকুর, তুমি ওকে বলো-না! ও আমাদের কথা শুনবে না। কিন্তু উপনন্দকে না হলে মজা হবে না।

সন্ন্যাসী

পাশে বসিয়া

বাছা, তুমি কী কাজ করছ। আজ তো কাজের দিন না।

উপনন্দ

সন্ন্যাসীর মুখের দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া
পায়ের ধুলা লইয়া

আজ ছুটির দিন— কিন্তু আমার ঋণ আছে, শোধ করতে হবে, তাই আজ কাজ করছি।

ঠাকুরদাদা

উপনন্দ, জগতে তোমার আবার ঋণ কিসের ভাই!

উপনন্দ

ঠাকুরদাদা, আমার প্রভু মারা গিয়েছেন; তিনি লক্ষেশ্বরের কাছে ঋণী; সেই ঋণ আমি পুঁথি লিখে শোধ দেব।

ঠাকুরদাদা

হায় হায়, তোমার মতো কাঁচা বয়সের ছেলেকেও ঋণ শোধ করতে হয়! আর এমন দিনেও ঋণশোধ! ঠাকুর, আজ নতুন উত্তরে হাওয়ায় ও পারে কাশের বনে ঢেউ দিয়েছে, এ পারে ধানের খেতের সবুজে চোখ একেবারে ডুবিয়ে দিলে, শিউলি-বন থেকে আকাশে আজ পুজোর গন্ধ ভরে উঠেছে, এরই মাঝখানে ঐ ছেলেটি আজ ঋণশোধের আয়োজনে বসে গেছে এও কি চক্ষে দেখা যায়।

সন্ন্যাসী

বল কী, এর চেয়ে সুন্দর কি আর কিছু আছে! ঐ

ছেলেটিই তো আজ সারদার বরপুত্র হয়ে তাঁর কোল উজ্জ্বল করে বসেছে। তিনি তাঁর আকাশের সমস্ত সোনার আলো দিয়ে ওকে বুকে চেপে ধরেছেন। আহা, আজ এই বালকের ঋণশোধের মতো এমন শুভ্র ফুলটি কি কোথাও ফুটেছে, চেয়ে দেখো তো! লেখো, লেখো, বাবা, তুমি লেখো, আমি দেখি! তুমি পঙ্‌ক্তির পর পঙ্‌ক্তি লিখছ, আর ছুটির পর ছুটি পাচ্ছ — তোমার এত ছুটির আয়োজন আমরা তো পণ্ড করতে পারব না। দাও বাবা, একটা পুঁথি আমাকে দাও, আমিও লিখি। এমন দিনটা সার্থক হোক।

ঠাকুরদাদা

আছে আছে, চশমাটা টেঁকে আছে, আমিও বসে যাই-না।

প্রথম বালক

ঠাকুর, আমরাও লিখব। সে বেশ মজা হবে।

দ্বিতীয় বালক

হাঁ হাঁ, সে বেশ মজা হবে।

উপনন্দ

বল কী ঠাকুর, তোমাদের যে ভারী কষ্ট হবে।

সন্ন্যাসী

সেইজন্যেই বসে গেছি। আজ আমরা সব মজা করে কষ্ট করব। কী বল বাবা-সকল। আজ একটা কিছু কষ্ট না করলে আনন্দ হচ্ছে না।

সকলে

হাততালি দিয়া

হাঁ হাঁ, নইলে মজা কিসের।

প্রথম বালক

দাও, দাও, আমাকে একটা পুঁথি দাও।

দ্বিতীয় বালক

আমাকেও একটা দাও-না।

উপনন্দ

তোমরা পারবে তো ভাই ?

প্রথম বালক

খুব পারব। কেন পারব না।

উপনন্দ

শ্রান্ত হবে না তো ?

দ্বিতীয় বালক

কখ্‌খনো না।

উপনন্দ

খুব ধরে ধরে লিখতে হবে কিন্তু।

প্রথম বালক

তা বুঝি পারি নে ? আচ্ছা, তুমি দেখো।

উপনন্দ

ভুল থাকলে চলবে না।

দ্বিতীয় বালক

কিচ্ছু ভুল থাকবে না।

প্রথম বালক

এ বেশ মজা হচ্ছে। পুঁথি শেষ করব তবে ছাড়ব।

দ্বিতীয় বালক

নইলে ওঠা হবে না।

তৃতীয় বালক

কী বল ঠাকুরদা, আজ লেখা শেষ করে দিয়ে তবে উপনন্দকে নিয়ে নৌকো বাচ করতে যাব। বেশ মজা!

ঠাকুরদাদার গান

সিন্ধুভৈরবী। তেওরা

আনন্দেরই সাগর থেকে
এসেছে আজ বান।
দাঁড় ধ'রে আজ বোস্ রে সবাই,
টান্ রে সবাই টান্।
বোঝা যত বোঝাই করি
করব রে পার দুখের তরী,
ঢেউয়ের 'পরে ধরব পাড়ি,
যায় যদি যাক প্রাণ।
কে ডাকে রে পিছন হতে,
কে করে রে মানা।

ভয়ের কথা কে বলে আজ,

ভয় আছে সব জানা।

কোন্ শাপে কোন্ গ্রহের দোষে

সুখের ডাঙায় থাকব বসে?

পালের রসি ধরব কষি,

চলব গেয়ে গান।

সন্ন্যাসী

ঠাকুরদা!

ঠাকুরদাদা

জিভ কাটিয়া

প্রভু, তুমিও আমাকে পরিহাস করবে?

সন্ন্যাসী

তুমি যে জগতে ঠাকুরদা হয়েই জন্মগ্রহণ করেছ, ঈশ্বর সকলের সঙ্গেই তোমার হাসির সম্বন্ধ পাতিয়ে দিয়ে বসেছেন, সে তো তুমি লুকিয়ে রাখতে পারবে না। ছোটো ছোটো ছেলেগুলির কাছেও ধরা পড়েছ, আর আমাকেই ফাঁকি দেবে?

ঠাকুরদাদা

ছেলে-ভোলানোই যে আমার কাজ— তা ঠাকুর, তুমিও যদি ছেলের দলেই ভিড়ে যাও তা হলে কথা নেই। তা, কী আজ্ঞা কর।

সন্ন্যাসী

আমি বলছিলেম, ঐ যে গানটা গাইলে ওটা আজ ঠিক হল না। দুঃখ নিয়ে ঐ অত্যন্ত টানাটানির কথাটা ওটা আমার কানে ঠিক লাগছে না। দুঃখ তো জগৎ ছেয়েই আছে, কিন্তু চার দিকে চেয়ে দেখো-না, টানাটানির তো কোনো চেহারা দেখা যায় না। তাই এই শরৎ-প্রভাতের মান রাখবার জন্যে আমাকে আর-একটা গান গাইতে হল।

ঠাকুরদাদা

তোমাদের সঙ্গ এইজন্যেই এত দামি— ভুল করলেও ভুলকে সার্থক ক'রে তোল।

সন্ন্যাসী

গান

ললিত। আড়াঠেকা

তোমার সোনার থালায় সাজাব আজ
দুখের অশ্রুধার।
জননী গো, গাঁথব তোমার
গলার মুক্তাহার।
চন্দ্রসূর্য পায়ের কাছে
মালা হয়ে জড়িয়ে আছে,
তোমার বুকে শোভা পাবে আমার

দুখের অলংকার।

ধন ধান্য তোমারই ধন,

কী করবে তা কও।

দিতে চাও তো দিয়ো আমায়,

নিতে চাও তো লও।

দুঃখ আমার ঘরের জিনিস,

খাঁটি রতন তুই তো চিনিস—

তোর প্রসাদ দিয়ে তারে কিনিস

এ মোর অহংকার।

বাবা উপনন্দ, তোমার প্রভুর কী নাম ছিল।

উপনন্দ

সুরসেন।

সন্ন্যাসী

সুরসেন! বীণাচার্য!

উপনন্দ

হাঁ ঠাকুর। তুমি তাঁকে জানতে?

সন্ন্যাসী

আমি তাঁর বীণা শুনব আশা করেই এখানে এসেছিলেম।

উপনন্দ

তাঁর কি এত খ্যাতি ছিল!

ঠাকুরদাদা

তিনি কি এত বড়ো গুণী! তুমি তাঁর বাজনা শোনবার জন্যেই এ দেশে এসেছ? তবে তো আমরা তাঁকে চিনি নি।

সন্ন্যাসী

এখানকার রাজা?

ঠাকুরদাদা

এখানকার রাজা তো কোনোদিন তাঁকে ডাকেন নি, চক্ষেও দেখেন নি। তুমি তাঁর বীণা কোথায় শুনলে!

সন্ন্যাসী

তোমরা হয়তো জান না বিজয়াদিত্য ব'লে একজন রাজা—

ঠাকুরদাদা

বল কী ঠাকুর! আমরা অত্যন্ত মূর্খ, গ্রাম্য, তাই বলে বিজয়াদিত্যের নাম জানব না এও কি হয়। তিনি যে আমাদের চক্রবর্তী সম্রাট।

সন্ন্যাসী

তা হবে। তা সেই লোকটির সভায় একদিন সুরসেন বীণা বাজিয়েছিলেন, তখন শুনেছিলেম। রাজা তাঁকে রাজধানীতে রাখবার জন্যে অনেক চেষ্টা করেও কিছুতেই পারেন নি।

ঠাকুরদাদা

হায় হায়, এত বড়ো লোকের আমরা কোনো আদর করতে পারি নি!

সন্ন্যাসী

আদর কর নি— তাতে তাঁকে কমাতে পার নি, আরও তাঁকে বড়ো করেছ। ভগবান তাঁকে নিজের সভায় ডেকে নিয়েছেন।

বাবা উপনন্দ, তোমার সঙ্গে তাঁর কিরকমে সম্বন্ধ হল।

উপনন্দ

ছোটো বয়সে আমার বাপ মারা গেলে আমি অন্য দেশ থেকে এই নগরে আশ্রয়ের জন্যে এসেছিলেম। সেদিন শ্রাবণমাসের সকালবেলায় আকাশ ভেঙে বৃষ্টি পড়ছিল, আমি লোকনাথের মন্দিরের এক কোণে দাঁড়াব বলে প্রবেশ করছিলেম। পুরোহিত আমাকে বোধ হয় নীচ জাত মনে করে তাড়িয়ে দিলেন। সেদিন সকালে সেইখানে বসে আমার প্রভু বীণা বাজাচ্ছিলেন। তিনি তখনই মন্দির ছেড়ে এসে আমার গলা জড়িয়ে ধরলেন— বললেন, এসো বাবা, আমার ঘরে এসো। সেই দিন থেকে ছেলের মতো তিনি আমাকে কাছে রেখে মানুষ করেছেন— লোকে তাঁকে কত কথা বলেছে, তিনি কান দেন নি। আমি তাঁকে বলেছিলেম, প্রভু, আমাকে বীণা বাজাতে

শেখান, আমি তা হলে কিছু কিছু উপার্জন করে আপনার হাতে দিতে পারব। তিনি বললেন, বাবা, এ বিদ্যা পেট ভরাবার নয়; আমার আর-এক বিদ্যা জানা আছে তাই তোমাকে শিখিয়ে দিচ্ছি। এই ব'লে আমাকে রঙ দিয়ে চিত্র করে পুঁথি লিখতে শিখিয়েছেন। যখন অত্যন্ত অচল হয়ে উঠত তখন তিনি মাঝে মাঝে বিদেশে গিয়ে বীণা বাজিয়ে টাকা নিয়ে আসতেন। এখানে তাঁকে সকলে পাগল বলেই জানত।

সন্ন্যাসী

সুরসেনের বীণা শুনতে পেলেম না, কিন্তু বাবা উপনন্দ, তোমার কল্যাণে তাঁর আর-এক বীণা শুনে নিলুম, এর সুর কোনোদিন ভুলব না।— বাবা, লেখো লেখো।

ছেলেরা

ঐ রে ঐ আসছে! ঐ রে লখা, ঐ রে লক্ষ্মীপেঁচা।

দৌড়

লক্ষেশ্বর

আ সর্বনাশ! যেখানটিতে আমি কৌটো পুঁতে রেখেছিলুম ঠিক সেই জায়গাটিতেই যে উপনন্দ বসে গেছে! আমি ভেবেছিলেম ছোঁড়াটা বোকা বুঝি, তাই পরের ঋণ

শুধতে এসেছে। তা তো নয় দেখছি। পরের ঘাড় ভাঙাই ওর ব্যাবসা। আমার গজমোতির খবর পেয়েছে। একটা সন্ন্যাসীকেও কোথা থেকে জুটিয়ে এনেছে দেখছি। সন্ন্যাসী হাত চেলে জায়গাটা বের করে দেবে।—

উপনন্দ!

উপনন্দ

কী।

লক্ষেশ্বর

ওঠ্‌ ওঠ্‌ ঐ জায়গা থেকে। এখানে কী করতে এসেছিস।

উপনন্দ

অমন করে চোখ রাঙাও কেন। এ কি তোমার জায়গা নাকি।

লক্ষেশ্বর

এটা আমার জায়গা কি না সে খোঁজে তোমার দরকার কী হে বাপু! ভারী সেয়ানা দেখছি। তুমি বড়ো ভালোমানুষটি সেজে আমার কাছে এসেছিলে। আমি বলি সত্যিই বুঝি প্রভুর ঋণশোধ করবার জন্যেই ছোঁড়াটা আমার কাছে এসেছে— কেননা, সেটা রাজার আইনেও আছে—

উপনন্দ

আমি তো সেইজন্যেই এখানে পুঁথি লিখতে এসেছি।

লক্ষেশ্বর

সেইজন্যেই এসেছ বটে! আমার বয়স কত আন্দাজ করছ বাপু। আমি কি শিশু।

সন্ন্যাসী

কেন বাবা, তুমি কী সন্দেহ করছ।

লক্ষেশ্বর

কী সন্দেহ করছি! তুমি তা কিছু জান না! বড়ো সাধু! ভণ্ড সন্ন্যাসী কোথাকার!

ঠাকুরদাদা

আরে কী বলিস লখা। আমার ঠাকুরকে অপমান!

উপনন্দ

এই রঙবাঁটা নোড়া দিয়ে তোমার মুখ গুঁড়িয়ে দেব না? টাকা হয়েছে বলে অহংকার! কাকে কী বলতে হয় জান না!

সন্ন্যাসীর পশ্চাতে লক্ষেশ্বরের লুক্কায়ন

সন্ন্যাসী

আরে কর কী ঠাকুরদা, কর কী বাবা! লক্ষেশ্বর তোমাদের চেয়ে ঢের বেশি মানুষ চেনে। যেমনি দেখেছে অমনি ধরা পড়ে গেছে। ভণ্ড সন্ন্যাসী যাকে বলে! বাবা

লক্ষেশ্বর, এত দেশের এত মানুষ ভুলিয়ে এলেম, তোমাকে ভোলাতে পারলেম না।

লক্ষেশ্বর

না, ঠিক ঠাওরাতে পারছি নে। হয়তো ভালো করি নি। আবার শাপ দেবে কি কী করবে! তিনখানা জাহাজ এখনও সমুদ্রে আছে।

পায়ের ধুলা লইয়া

প্রণাম হই ঠাকুর! হঠাৎ চিনতে পারি নি। বিরূপাক্ষের মন্দিরে আমাদের ঐ বিকটানন্দ বলে একটা সন্ন্যাসী আছে, আমি বলি সেই ভণ্ডটাই বুঝি! ঠাকুরদা, তুমি এক কাজ করো। সন্ন্যাসীঠাকুরকে আমার ঘরে নিয়ে যাও; আমি ওঁকে কিছু ভিক্ষে দিয়ে দেব। আমি চললেম ব'লে। তোমরা এগোও।

ঠাকুরদাদা

তোমার বড়ো দয়া! তোমার ঘরের এক মুঠো চাল নেবার জন্যে ঠাকুর সাত সিন্ধু পেরিয়ে এসেছেন!

সন্ন্যাসী

বল কী ঠাকুরদা! এক মুঠো চাল যেখানে দুর্লভ সেখান থেকে সেটি নিতে হবে বৈকি! বাবা লক্ষেশ্বর, চলো তোমার ঘরে।

লক্ষেশ্বর

আমি পরে যাচ্ছি, তোমরা এগোও। উপনন্দ, তুমি আগে ওঠো। ওঠো, শীঘ্র ওঠো বলছি, তোলো তোমার পুঁথিপত্র।

উপনন্দ

আচ্ছা, তবে উঠলেম, কিন্তু তোমার সঙ্গে আমার কোনো সম্বন্ধ রইল না।

লক্ষেশ্বর

না থাকলেই যে বাঁচি বাবা। আমার সম্বন্ধে কাজ কী। এত দিন তো আমার বেশ চলে যাচ্ছিল।

উপনন্দ

আমি যে ঋণ স্বীকার করেছিলেম, তোমার কাছে এই অপমান সহ্য করেই তার থেকে মুক্তি গ্রহণ করলেম। বাস্, চুকে গেল।

প্রস্থান

লক্ষেশ্বর

ওরে! সব ঘোড়সওয়ার আসে কোথা থেকে! রাজা আমার গজমোতির খবর পেলে নাকি! এর চেয়ে উপনন্দ যে ছিল ভালো। এখন কী করি।

সন্ন্যাসীকে ধরিয়া

ঠাকুর, তোমার পায়ে ধরি, তুমি ঠিক এইখানটিতে বোসো— এই-যে এইখানে— আর-একটু বাঁ দিকে সরে

এসো— এই হয়েছে। খুব চেপে বোসো। রাজাই আসুক আর সম্রাটই আসুক তুমি কোনোমতেই এখান থেকে উঠো না। তা হলে আমি তোমাকে খুশি করে দেব।

ঠাকুরদাদা

আরে লখা করে কী। হঠাৎ খেপে গেল নাকি।

লক্ষেশ্বর

ঠাকুর, আমি তবে একটু আড়ালে যাই। আমাকে দেখলেই রাজার টাকার কথা মনে পড়ে যায়। শত্রুরা লাগিয়েছে, আমি সব টাকা পুঁতে রেখেছি— শুনে অবধি রাজা যে কত জায়গায় কূপ খুঁড়তে আরম্ভ করেছেন তার ঠিকানা নেই। জিজ্ঞাসা করলে বলেন, প্রজাদের জলদান করছেন। কোন্‌দিন আমার ভিটেবাড়ির ভিত কেটে জল-দানের হুকুম হবে, সেই ভয়ে রাত্রে ঘুমোতে পারি নে।

প্রস্থান

রাজদূতের প্রবেশ

দূত

সন্ন্যাসীঠাকুর, প্রণাম হই। আপনিই তো অপূর্বানন্দ ?

সন্ন্যাসী

কেউ কেউ আমাকে তাই বলেই তো জানে।

দূত

আপনার অসামান্য ক্ষমতার কথা চার দিকে রাষ্ট্র হয়ে গেছে। আমাদের মহারাজ সোমপাল আপনার সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছা করেন।

সন্ন্যাসী

যখনই আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন তখনই আমাকে দেখতে পাবেন।

দূত

আপনি তা হলে যদি একবার—

সন্ন্যাসী

আমি একজনের কাছে প্রতিশ্রুত আছি এইখানেই আমি অচল হয়ে বসে থাকব। অতএব আমার মতো অকিঞ্চন অকর্মণ্যকেও তোমার রাজার যদি বিশেষ প্রয়োজন থাকে তা হলে তাঁকে এইখানেই আসতে হবে।

দূত

রাজোদ্যান অতি নিকটেই— ঐখানেই তিনি অপেক্ষা করছেন।

সন্ন্যাসী

যদি নিকটেই হয় তবে তো তাঁর আসতে কোনো কষ্ট হবে না।

দূত

যে আজ্ঞা, তবে ঠাকুরের ইচ্ছা তাঁকে জানাই গে।

প্রস্থান

ঠাকুরদাদা

প্রভু, এখানে রাজসমাগমের সম্ভাবনা হয়ে এল, আমি তবে বিদায় হই।

সন্ন্যাসী

ঠাকুরদা, তুমি আমার শিশু-বন্ধুগুলিকে নিয়ে ততক্ষণ আসর জমিয়ে রাখো, আমি বেশি বিলম্ব করব না।

ঠাকুরদাদা

রাজার উৎপাতই ঘটুক আর অরাজকতাই হোক আমি প্রভুর চরণ ছাড়ছি নে।

প্রস্থান

লক্ষেশ্বরের প্রবেশ

লক্ষেশ্বর

ঠাকুর, তুমিই অপূর্বানন্দ! তবে তো বড়ো অপরাধ হয়ে গেছে। আমাকে মাপ করতে হবে।

সন্ন্যাসী

তুমি আমাকে ভণ্ডতপস্বী বলেছ এই যদি তোমার অপরাধ হয় আমি তোমাকে মাপ করলেম।

লক্ষেশ্বর

বাবাঠাকুর, শুধু মাপ করতে তো সকলেই পারে— সে ফাঁকিতে আমার কী হবে। আমাকে একটা কিছু ভালো রকম বর দিতে হচ্ছে। যখন দেখা পেয়েছি তখন শুধুহাতে ফিরছি নে।

সন্ন্যাসী

কী বর চাই।

লক্ষেশ্বর

লোকে যতটা মনে করে ততটা নয়, তবে কিনা আমার অল্পস্বল্প কিছু জমেছে— সে অতি যৎসামান্য— তাতে আমার মনের আকাঙ্ক্ষা তো মিটছে না। শরৎকাল এসেছে, আর ঘরে বসে থাকতে পারছি নে— এখন বাণিজ্যে বেরতে হবে। কোথায় গেলে সুবিধা হতে পারে আমাকে সেই সন্ধানটি বলে দিতে হবে— আমাকে আর যেন ঘুরে বেড়াতে না হয়।

সন্ন্যাসী

আমিও তো সেই সন্ধানেই আছি।

লক্ষেশ্বর

বল কী ঠাকুর!

সন্ন্যাসী

আমি সত্যই বলছি।

লক্ষেশ্বর

ওঃ, তবে সেই কথাটাই বলো। বাবা, তোমরা আমাদের চেয়েও সেয়ানা।

সন্ন্যাসী

তার সন্দেহ আছে?

লক্ষেশ্বর

কাছে ঘেঁষিয়া বসিয়া মৃদুস্বরে

সন্ধান কিছু পেয়েছ?

সন্ন্যাসী

কিছু পেয়েছি বৈকি। নইলে এমন করে ঘুরে বেড়াব কেন।

লক্ষেশ্বর

সন্ন্যাসীর পা চাপিয়া ধরিয়া

বাবাঠাকুর, আর-একটু খোলসা করে বলো। তোমার পা ছুঁয়ে বলছি আমিও তোমাকে একেবারে ফাঁকি দেব না। কী খুঁজছ বলো তো, আমি কাউকে বলব না।

সন্ন্যাসী

তবে শোনো। লক্ষ্মী যে সোনার পদ্মটির উপরে পা দুখানি রাখেন আমি সেই পদ্মটির খোঁজে আছি।

লক্ষেশ্বর

ও বাবা! সে তো কম কথা নয়। তা হলে যে একেবারে সকল লেঠাই চোকে। ঠাকুর, ভেবে ভেবে এ তো তুমি আচ্ছা বুদ্ধি ঠাওরেছ। কোনোগতিকে পদ্মটি যদি জোগাড় করে আন তা হলে লক্ষ্মীকে আর তোমার খুঁজতে হবে না, লক্ষ্মীই তোমাকে খুঁজে বেড়াবেন; এ নইলে আমাদের

চঞ্চলা ঠাকরুনটিকে তো জব্দ করবার জো নেই। তোমার কাছে তাঁর পা দুখানিই বাঁধা থাকবে। তা, তুমি সন্ন্যাসী মানুষ, একলা পেরে উঠবে? এতে তো খরচপত্র আছে। এক কাজ করো-না বাবা, আমরা ভাগে ব্যাবসা করি।

সন্ন্যাসী

তা হলে তোমাকে যে সন্ন্যাসী হতে হবে। বহুকাল সোনা ছুঁতেই পাবে না।

লক্ষেশ্বর

সে যে শক্ত কথা।

সন্ন্যাসী

সব ব্যাবসা যদি ছাড়তে পার তবেই এ ব্যাবসা চলবে।

লক্ষেশ্বর

শেষকালে দু কূল যাবে না তো? যদি একেবারে ফাঁকিতে না পড়ি তা হলে তোমার তল্পি বয়ে তোমার পিছন পিছন চলতে রাজি আছি। সত্যি বলছি ঠাকুর, কারও কথায় বড়ো সহজে বিশ্বাস করি নে— কিন্তু তোমার কথাটা কেমন মনে লাগছে। আচ্ছা! আচ্ছা রাজি! তোমার চেলাই হব।

ঐ রে রাজা আসছে! আমি তবে একটু আড়ালে দাঁড়াই গে।

বন্দীগণের গান

মিশ্র কানাড়া। ঝাঁপতাল

রাজরাজেন্দ্র জয় জয়তু জয় হে !

ব্যাপ্ত পরতাপ তব বিশ্বময় হে !

দুষ্টদলদলন তব দণ্ড ভয়কারী,

শত্রুজনদর্পহর দীপ্ত তরবারী,

সংকটশরণ্য তুমি দৈন্যদুখহারী,

মুক্ত-অবরোধ তব অভ্যুদয় হে।

রাজার প্রবেশ

রাজা

প্রণাম হই ঠাকুর।

সন্ন্যাসী

জয় হোক। কী বাসনা তোমার।

রাজা

সে কথা নিশ্চয় তোমার অগোচর নেই। আমি অখণ্ড রাজ্যের অধীশ্বর হতে চাই প্রভু !

সন্ন্যাসী

তা হলে গোড়া থেকে শুরু করো। তোমার খণ্ডরাজ্যটি ছেড়ে দাও।

রাজা

পরিহাস নয় ঠাকুর! বিজয়াদিত্যের প্রতাপ আমার

অসহ্য বোধ হয়, আমি তার সামন্ত হয়ে থাকতে পারব না।

সন্ন্যাসী

রাজন্, তবে সত্য কথা বলি, আমার পক্ষেও সে ব্যক্তি অসহ্য হয়ে উঠেছে।

রাজা

বল কী ঠাকুর!

সন্ন্যাসী

এক বর্ণও মিথ্যা বলছি নে। তাকে বশ করবার জন্যেই আমি মন্ত্রসাধনা করছি।

রাজা

তাই তুমি সন্ন্যাসী হয়েছ?

সন্ন্যাসী

তাই বটে।

রাজা

মন্ত্রে সিদ্ধি লাভ হবে?

সন্ন্যাসী

অসম্ভব নয়।

রাজা

তা হলে ঠাকুর, আমার কথা মনে রেখো। তুমি যা চাও

আমি তোমাকে দেব। যদি সে বশ মানে তা হলে আমার কাছে যদি—

সন্ন্যাসী

তা বেশ, সেই চক্রবর্তী সম্রাটকে আমি তোমার সভায় ধরে আনব।

রাজা

কিন্তু বিলম্ব করতে ইচ্ছা করছে না। শরৎকাল এসেছে— সকাল বেলা উঠে, বেতসিনীর জলের উপর যখন আশ্বিনের রৌদ্র পড়ে, তখন আমার সৈন্যসামন্ত নিয়ে দিগ্বিজয়ে বেরিয়ে পড়তে ইচ্ছে করে। যদি আশীর্বাদ কর তা হলে—

সন্ন্যাসী

কোনো প্রয়োজন নেই; শরৎকালেই আমি তাকে তোমার কাছে সমর্পণ করব। এই তো উপযুক্ত কাল। তুমি তাকে নিয়ে কী করবে।

রাজা

আমার একটা কোনো কাজে লাগিয়ে দেব— তার অহংকার দূর করতে হবে।

সন্ন্যাসী

এ তো খুব ভালো কথা। যদি তার অহংকার চূর্ণ করতে পার তা হলে ভারী খুশি হব।

রাজা

ঠাকুর, চলো আমার রাজভবনে।

সন্ন্যাসী

সেটি পারছি নে। আমার দলের লোকদের অপেক্ষায় আছি। তুমি যাও বাবা। আমার জন্যে কিচ্ছু ভেবো না। তোমার মনের বাসনা যে আমাকে ব্যক্ত করে বলেছ এতে আমার ভারী আনন্দ হচ্ছে। বিজয়াদিত্যের যে এত শত্রু জমে উঠেছে তা তো আমি জানতেম না।

রাজা

তবে বিদায় হই। প্রণাম!

প্রস্থান। পুনশ্চ ফিরিয়া আসিয়া

আচ্ছা ঠাকুর, তুমি তো বিজয়াদিত্যকে জান, সত্য করে বলো দেখি, লোকে তার সম্বন্ধে যতটা রটনা করে ততটা কি সত্য।

সন্ন্যাসী

কিছুমাত্র না। লোকে তাকে একটা মস্ত রাজা বলে মনে করে, কিন্তু সে নিতান্তই সাধারণ মানুষের মতো। তার সাজসজ্জা দেখেই লোকে ভুলে গেছে।

রাজা

বলো কী ঠাকুর! হা হা হা হা! আমিও তাই ঠাউরেছিলেম। অ্যাঁ! নিতান্তই সাধারণ মানুষ!

সন্ন্যাসী

আমার ইচ্ছে আছে, আমি তাকে সেইটে আচ্ছা করে বুঝিয়ে দেব। সে যে রাজার পোশাক প'রে ফাঁকি দিয়ে অন্য পাঁচ জনের চেয়ে নিজেকে মস্ত একটা কিছু ব'লে মনে করে, আমি তার সেই ভুলটা একেবারে ঘুচিয়ে দেব।

রাজা

তাই দিয়ো ঠাকুর, তাই দিয়ো।

সন্ন্যাসী

তার ভণ্ডামি আমার কাছে তো কিছু ঢাকা নেই। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রথম বৃষ্টি হলে পর বীজ বোনবার আগে তার রাজ্যে একটা মহোৎসব হয়। সেদিন সব চাষি গৃহস্থরা বনে গিয়ে সীতার পূজা করে সকলে মিলে বনভোজন করে। সেই চাষাদের সঙ্গে একসঙ্গে পাত পেড়ে খাবার জন্যে বিজয়াদিত্যের প্রাণটা কাঁদে। রাজাই হোক আর যাই হোক, ভিতরে যে চাষাটা আছে সেটা যাবে কোথায়! সেবারে তো সে রাজবেশ ছেড়ে ওদের সঙ্গে বসে খাবার জন্যে খেপে উঠেছিল। কিন্তু ওর মন্ত্রী আর চাকর-বাকরদের মনে রাজাগিরির উচ্চ ভাব ওর চেয়ে অনেক বেশি আছে। তারা হাতে পায়ে ধরে বললে, এ কখনোই হতে পারে না। অর্থাৎ তাদের এই ভয়টা আছে যে, ঐ ছদ্মবেশটা খুলে ফেললেই আসল মানুষটা ধরা পড়ে

যাবে। এইজন্যে বিজয়াদিত্যকে নিয়ে তারা বড়ো ভয়ে ভয়েই থাকে— কোন্ দিন তার সমস্ত ফাঁস হয়ে যায় এই এক বিষম ভাবনা।

রাজা

ঠাকুর, তুমি সব ফাঁস করে দাও। ও যে মিথ্যে রাজা, ভুয়ো রাজা, সে যেন আর ছাপা না থাকে। ওর বড়ো অহংকার হয়েছে।

সন্ন্যাসী

আমি তো সেই চেষ্টাতেই আছি। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো, যতক্ষণ না আমার অভিপ্রায় সিদ্ধ হয় আমি সহজে ছাড়ব না।

রাজা

প্রণাম!

প্রস্থান

উপনন্দের প্রবেশ

উপনন্দ

ঠাকুর, আমার মনের ভার তো গেল না।

সন্ন্যাসী

কী হল বাবা!

উপনন্দ

মনে করেছিলেম লক্ষেশ্বর যখন আমাকে অপমান

করেছে তখন ওর কাছে আমি আর ঋণ স্বীকার করব না। তাই পুঁথিপত্র নিয়ে ঘরে ফিরে গিয়েছিলেম। সেখানে আমার প্রভুর বীণাটি নিয়ে তার ধুলো ঝাড়তে গিয়ে তারগুলি বেজে উঠল— অমনি আমার মনটার ভিতর যে কেমন হল সে আমি বলতে পারি নে। সেই বীণার কাছে লুটিয়ে পড়ে বুক ফেটে আমার চোখের জল পড়তে লাগল। মনে হল আমার প্রভুর কাছে আমি অপরাধ করেছি। লক্ষেশ্বরের কাছে আমার প্রভু ঋণী হয়ে রইলেন, আর আমি নিশ্চিন্ত হয়ে আছি! ঠাকুর, এ তো আমার কোনো-মতেই সহ্য হচ্ছে না। ইচ্ছা করছে আমার প্রভুর জন্যে আজ আমি অসাধ্য কিছু একটা করি। আমি তোমাকে মিথ্যা বলছি নে, তাঁর ঋণ শোধ করতে যদি আজ প্রাণ দিতে পারি তা হলে আমার খুব আনন্দ হবে— মনে হবে আজকের এই সুন্দর শরতের দিন আমার পক্ষে সার্থক হল।

সন্ন্যাসী

বাবা, তুমি যা বলছ সত্যই বলছ।

উপনন্দ

ঠাকুর, তুমি তো অনেক দেশ ঘুরেছ, আমার মতো অকর্মণ্যকেও হাজার কার্ষাপণ দিয়ে কিনতে পারেন এমন মহাত্মা কেউ আছেন? তা হলেই ঋণটা শোধ হয়ে যায়।

এ নগরে যদি চেষ্টা করি তা হলে বালক ব'লে, ছোটো জাত ব'লে, সকলে আমাকে খুব কম দাম দেবে।

সন্ন্যাসী

না বাবা, তোমার মূল্য এখানে কেউ বুঝবে না। আমি ভাবছি কী, যিনি তোমার প্রভুকে অত্যন্ত আদর করতেন সেই বিজয়াদিত্য ব'লে রাজাটার কাছে গেলে কেমন হয়।

উপনন্দ

বিজয়াদিত্য? তিনি যে আমাদের সম্রাট!

সন্ন্যাসী

তাই নাকি?

উপনন্দ

তুমি জান না বুঝি?

সন্ন্যাসী

তা হবে। নাহয় তাই হল।

উপনন্দ

আমার মতো ছেলেকে তিনি কি দাম দিয়ে কিনবেন।

সন্ন্যাসী

বাবা, বিনা মূল্যে কেনবার মতো ক্ষমতা তাঁর যদি থাকে তা হলে বিনা মূল্যেই কিনবেন। কিন্তু তোমার ঋণ-টুকু শোধ করে না দিতে পারলে তাঁর এত ঋণ জমবে যে তাঁর রাজভাণ্ডার লজ্জিত হবে, এ আমি তোমাকে সত্যিই বলছি।

উপনন্দ

ঠাকুর, এও কি সম্ভব।

সন্ন্যাসী

বাবা, জগতে কেবল কি এক লক্ষেশ্বরই সম্ভব, তার চেয়ে বড়ো সম্ভাবনা কি আর কিছুই নেই।

উপনন্দ

আচ্ছা, যদি সে সম্ভব হয় তো হবে, কিন্তু আমি ততদিন পুঁথিগুলি নকল করে কিছু কিছু শোধ করতে থাকি— নইলে আমার মনে বড়ো গ্লানি হচ্ছে।

সন্ন্যাসী

ঠিক কথা বলেছ বাবা। বোঝা মাথায় তুলে নাও, কারও প্রত্যাশায় ফেলে রেখে সময় বইয়ে দিয়ো না।

উপনন্দ

তা হলে চললেম ঠাকুর। তোমার কথা শুনে আমি মনে কত যে বল পেয়েছি সে আমি বলে উঠতে পারি নে।

সন্ন্যাসী

তোমাকে দেখে আমিও যে কত বল লাভ করেছি সে কথা কেমন করে বুঝবে। এক কাজ করো বাবা, আমার খেলার দলটি ভেঙে গিয়েছে, আবার তাদের সকলকে ডেকে নিয়ে এসো গে।

উপনন্দ

তা আনছি, কিন্তু ঠাকুর, তোমার দলটিকে আমার পুঁথি নকল করার কাজে লাগালে চলবে না। তারা আমার সব নষ্ট করে দেয়; এত খুশি হয়ে করে যে বারণ করতেও পারি নে।

প্রস্থান

লক্ষেশ্বরের প্রবেশ

লক্ষেশ্বর

ঠাকুর, অনেক ভেবে দেখলেম— পারব না। তোমার চেলা হওয়া আমার কর্ম নয়। যা পেয়েছি তা অনেক দুঃখে পেয়েছি, তোমার এক কথায় সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে শেষকালে হায়-হায় করে মরব! আমার বেশি আশায় কাজ নেই।

সন্ন্যাসী

সে কথাটা বুঝলেই হল।

লক্ষেশ্বর

ঠাকুর, এবার একটুখানি উঠতে হচ্ছে।

সন্ন্যাসী

উঠিয়া

তা হলে তোমার কাছ থেকে ছুটি পাওয়া গেল।

লক্ষেশ্বর

মাটি ও শুষ্কপত্র সরাইয়া কৌটা বাহির করিয়া

ঠাকুর, এইটুকুর জন্যে আজ সকাল থেকে সমস্ত হিসাব-কিতাব ফেলে রেখে এই জায়গাটার চার দিকে ভূতের মতো ঘুরে বেড়িয়েছি। এই যে গজমোতি, এ আমি তোমাকেই আজ প্রথম দেখালেম। আজ পর্যন্ত কেবলই এটাকে লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়িয়েছি; তোমাকে দেখাতে পেরে মনটা তবু একটু হাল্কা হল।

সন্ন্যাসীর হাতের কাছে অগ্রসর করিয়াই
তাড়াতাড়ি ফিরাইয়া লইয়া

না, হল না! তোমাকে যে এত বিশ্বাস করলেম, তবু এ জিনিস একটিবার তোমার হাতে তুলে দিই এমন শক্তি আমার নেই। এই-যে আলোতে এটাকে তুলে ধরেছি, আমার বুকের ভিতরে যেন গুর্‌গুর্‌ করছে। আচ্ছা ঠাকুর, বিজয়াদিত্য কেমন লোক বলো তো। তাকে বিক্রি করতে গেলে সে তো দাম না দিয়ে এটা আমার কাছ থেকে জোর করে কেড়ে নেবে না? আমার ঐ এক মুশকিল হয়েছে। আমি এটা বেচতেও পারছি নে, রাখতেও পারছি নে, এর জন্যে আমার রাত্রে ঘুম হয় না।—

বিজয়াদিত্যকে তুমি বিশ্বাস কর?

সন্ন্যাসী

সব সময়েই কি তাকে বিশ্বাস করা যায়।

লক্ষেশ্বর

সেই তো মুশকিলের কথা। আমি দেখছি, এটা মাটিতেই পোঁতা থাকবে, হঠাৎ কোন্ দিন মরে যাব, কেউ সন্ধানও পাবে না।

সন্ন্যাসী

রাজাও না, সম্রাটও না, ঐ মাটিই সব ফাঁকি দিয়ে নেবে। তোমাকেও নেবে, আমাকেও নেবে।

লক্ষেশ্বর

তা নিক গে, কিন্তু আমার কেবলই ভাবনা হয়, আমি মরে গেলে পর কোথা থেকে কে এসে হঠাৎ হয়তো খুঁড়তে খুঁড়তে ওটা পেয়ে যাবে। যাই হোক ঠাকুর, কিন্তু তোমার মুখে ঐ সোনার পদ্মর কথাটা আমার কাছে বড়ো ভালো লাগল। আমার কেমন মনে হচ্ছে, ওটা তুমি হয়তো খুঁজে বের করতে পারবে। কিন্তু তা হোক গে, আমি তোমার চেলা হতে পারব না। প্রণাম।

প্রস্থান

ঠাকুরদাদার প্রবেশ

সন্ন্যাসী

ঠাকুরদা, আজ অনেক দিন পরে একটি কথা খুব স্পষ্ট

বুঝতে পেরেছি— সেটি তোমাকে খুলে না বলে থাকতে পারছি নে।

ঠাকুরদাদা

আমার প্রতি ঠাকুরের বড়ো দয়া!

সন্ন্যাসী

আমি অনেকদিন ভেবেছি, জগৎ এমন আশ্চর্য সুন্দর কেন। কিছুই ভেবে পাই নি। আজ স্পষ্ট প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছি— জগৎ আনন্দের ঋণ শোধ করছে। বড়ো সহজে করছে না, নিজের সমস্ত শক্তি দিয়ে সমস্ত ত্যাগ ক'রে করছে। সেইজন্যেই ধানের খেত এমন সবুজ ঐশ্বর্যে ভরে উঠেছে, বেতসিনীর নির্মল জল এমন কানায় কানায় পরিপূর্ণ। কোথাও সাধনার এতটুকু বিশ্রাম নেই, সেইজন্যেই এত সৌন্দর্য।

ঠাকুরদাদা

এক দিকে অনন্ত ভাণ্ডার থেকে তিনি কেবলই ঢেলে দিচ্ছেন, আর-এক দিকে কঠিন দুঃখে তারই শোধ চলছে। সেই দুঃখের আনন্দ এবং সৌন্দর্য যে কী সে কথা তোমার কাছে পূর্বেই শুনেছি। প্রভু, কেবল এই দুঃখের জোরেই পাওয়ার সঙ্গে দেওয়ার ওজন বেশ সমান থেকে যাচ্ছে, মিলনটি এমন সুন্দর হয়ে উঠেছে!

সন্ন্যাসী

ঠাকুরদা, যেখানে আলস্য, যেখানে কৃপণতা, যেখানেই ঋণশোধে ঢিল পড়ে যাচ্ছে, সেইখানেই সমস্ত কুশ্রী, সমস্তই অব্যবস্থ।

ঠাকুরদাদা

সেইখানেই যে এক পক্ষে কম পড়ে যায়, অন্য পক্ষের সঙ্গে মিলন পুরো হতে পায় না।

সন্ন্যাসী

লক্ষ্মী যখন মানবের মর্তলোকে আসেন তখন দুঃখিনী হয়েই আসেন; তাঁর সেই সাধনার তপস্বিনী-বেশেই ভগবান মুগ্ধ হয়ে আছেন; শত দুঃখেরই দলে তাঁর সোনার পদ্ম সংসারে ফুটে উঠেছে, সে খবরটি আজ ঐ উপনন্দের কাছ থেকে পেয়েছি।

লক্ষেশ্বরের প্রবেশ

লক্ষেশ্বর

তোমরা চুপিচুপি দুটিতে কী পরামর্শ করছ।

সন্ন্যাসী

আমাদের সেই সোনার পদ্মের পরামর্শ।

লক্ষেশ্বর

অ্যাঁ! এরই মধ্যে ঠাকুরদার কাছে সমস্ত ফাঁস করে বসে আছ? বাবা, তুমি এই ব্যাবসাবুদ্ধি নিয়ে সোনার

পণ্যের আমদানি করবে? তবেই হয়েছে! তুমি যেই মনে করলে আমি রাজি হলেম না, অমনি তাড়াতাড়ি অন্য অংশীদার খুঁজতে লেগে গেছ! কিন্তু এ-সব কি ঠাকুরদার কর্ম। ওঁর পুঁজিই বা কী।

সন্ন্যাসী

তুমি খবর পাও নি। কিন্তু একেবারে পুঁজি নেই তা নয়! ভিতরে ভিতরে জমিয়েছে!

লক্ষেশ্বর

ঠাকুরদাদার পিঠ চাপড়াইয়া

সত্যি নাকি ঠাকুরদা। বড়ো তো ফাঁকি দিয়ে আসছ! তোমাকে তো চিনতেম না। লোকে আমাকেই সন্দেহ করে, তোমাকে তো স্বয়ং রাজাও সন্দেহ করে না। তা হলে এতদিনে খানাতল্লাসি পড়ে যেত। আমি তো দাদা, গুপ্তচরের ভয়ে ঘরে চাকরবাকর রাখি নে।

ঠাকুরদাদা

তবে যে আজ সকালে ছেলে তাড়াবার বেলায় ঊর্ধ্বস্বরে চোবে, তেওয়ারি, গিরিধারীলালকে হাঁক পাড়ছিলে!

লক্ষেশ্বর

যখন নিশ্চয় জানি হাঁক পাড়লেও কেউ আসবে না, তখন ঊর্ধ্বস্বরের জোরেই আসর গরম করে তুলতে হয়। কিন্তু ব'লে তো ভালো করলেম না। মানুষের সঙ্গে কথা

কবার তো বিপদই ঐ। সেইজন্যেই কারও কাছে ঘেঁষি নে। দেখো দাদা, ফাঁস করে দিয়ো না!

ঠাকুরদাদা

ভয় নেই তোমার।

লক্ষেশ্বর

ভয় না থাকলেও তবু ভয় ঘোচে কই। যা হোক ঠাকুর, একা ঠাকুরদাকে নিয়ে অত বড়ো কাজটা চলবে না। আমরা নাহয় তিন জনেই অংশীদার হব। ঠাকুরদা আমাকে ফাঁকি দিয়ে জিতে নেবে সেটি হচ্ছে না। আচ্ছা ঠাকুর, তবে আমিও তোমার চেলা হতে রাজি হলেম।

ঐ-যে ঝাঁকে ঝাঁকে মানুষ আসছে! ঐ দেখছ না দূরে? আকাশে যে ধুলো উড়িয়ে দিয়েছে! সবাই খবর পেয়েছে স্বামী অপূর্বানন্দ এসেছেন। এবার পায়ের ধুলো নিয়ে তোমার পায়ের তেলো হাঁটু পর্যন্ত খইয়ে দেবে। যাই হোক, তুমি যেরকম আলগা মানুষ দেখছি, সেই কথাটা আর কারও কাছে ফাঁস কোরো না— অংশীদার আর বাড়িয়ো না।

কিন্তু ঠাকুরদা, লাভ-লোকসানের ঝুঁকি তোমাকেও নিতে হবে; অংশীদার হলেই হয় না; সব কথা ভেবে দেখো।

প্রস্থান

সন্ন্যাসী

ঠাকুরদা, আর তো দেরি করলে চলবে না। লোকজন জুটতে আরম্ভ করেছে, 'পুত্র দাও' 'ধন দাও' করে আমাকে একেবারে মাটি করে দেবে। ছেলেগুলিকে এইবেলা ডাকো। তারা ধন চায় না, পুত্র চায় না, তাদের সঙ্গে খেলা জুড়ে দিলেই পুত্রধনের কাঙালরা আমাকে ত্যাগ করবে।

ঠাকুরদাদা

ছেলেদের আর ডাকতে হবে না। ঐ-যে আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। এল ব'লে।

লক্ষেশ্বরের পুনঃপ্রবেশ

লক্ষেশ্বর

না বাবা, আমি পারব না। ভালো বুঝতে পারছি নে! ও-সব আমার কাজ নেই— আমার যা আছে সেই ভালো! কিন্তু, তুমি আমাকে কী যেন মন্ত্র করেছ, তোমার কাছ থেকে না পালালে আমার তো রক্ষে নেই। তুমি ঠাকুরদাকে নিয়েই কারবার করো, আমি চললেম।

দ্রুত প্রস্থান

ছেলেদের প্রবেশ

ছেলেরা

সন্ন্যাসীঠাকুর! সন্ন্যাসীঠাকুর!

সন্ন্যাসী

কী বাবা।

ছেলেরা

তুমি আমাদের নিয়ে খেলো।

সন্ন্যাসী

সে কি হয় বাবা! আমার কি সে ক্ষমতা আছে। তোমরা আমাকে নিয়ে খেলাও!

ছেলেরা

কী খেলা খেলবে।

সন্ন্যাসী

আমরা আজ শারদোৎসব খেলব।

প্রথম বালক

সে বেশ হবে।

দ্বিতীয় বালক

সে বেশ মজা হবে।

তৃতীয় বালক

সে কী খেলা ঠাকুর।

চতুর্থ বালক

সে কেমন করে খেলতে হয়।

সন্ন্যাসী

তবে এক কাজ করো। ঐ কাশবন থেকে কাশ তুলে

নিয়ে এসো। আঁচল ভরে ধানের মঞ্জরী আনতে হবে। আর, তোমরা আজ শিউলিফুলের মালা গেঁথে ঐখানে ফেলে রেখে গেছ, সেগুলো নিয়ে এসো।

প্রথম বালক

কী করতে হবে ঠাকুর।

সন্ন্যাসী

আমাকে তোমরা সাজিয়ে দেবে— আমি হব শারদোৎ-সবের পুরোহিত।

সকলে

হাততালি দিয়া

হাঁ, হাঁ, হাঁ! সে বড়ো মজাই হবে।

কাশগুচ্ছ প্রভৃতি আনিয়া ছেলেরা সকলে মিলিয়া
সন্ন্যাসীকে সাজাইতে প্রবৃত্ত হইল

একদল লোকের প্রবেশ

প্রথম ব্যক্তি

ওরে ছোঁড়াগুলো, সন্ন্যাসী কোথায় গেল রে।

দ্বিতীয় ব্যক্তি

কই বাবা, সন্ন্যাসী কই।

বালকগণ

এই-যে আমাদের সন্ন্যাসী।

প্রথম ব্যক্তি

ও তো তোদের খেলার সন্ন্যাসী। সত্যিকার সন্ন্যাসী কোথায় গেলেন।

সন্ন্যাসী

সত্যিকার সন্ন্যাসী কি সহজে মেলে। আমি এই ছেলেদের সঙ্গে মিলে সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসী খেলছি।

প্রথম ব্যক্তি

ও তোমার কী রকম খেলা গা!

দ্বিতীয় ব্যক্তি

ওতে যে অপরাধ হবে।

তৃতীয় ব্যক্তি

ফেলো ফেলো, তোমার জটা ফেলো!

চতুর্থ ব্যক্তি

দেখো-না আবার গেরুয়া পরেছে!

সন্ন্যাসী

জটাও ফেলব, গেরুয়াও ছাড়ব, সবই হবে, খেলাটা সম্পূর্ণ হয়ে যাক।

প্রথম ব্যক্তি

তবে যে আমাদের কে একজন বললে, কোথাকার কোন্ একজন স্বামী এসেছে!

সন্ন্যাসী

যদি-বা এসে থাকে, তাকে দিয়ে তোমাদের কোনো কাজ হবে না।

দ্বিতীয় ব্যক্তি

কেন, সে ভণ্ড নাকি।

সন্ন্যাসী

তা নয় তো কী।

তৃতীয় ব্যক্তি

বাবা, তোমার চেহারাটি কিন্তু ভালো। তুমি মন্ত্রতন্ত্র কিছু শিখেছ ?

সন্ন্যাসী

শেখবার ইচ্ছা তো আছে কিন্তু শেখায় কে।

তৃতীয় ব্যক্তি

একটি লোক আছে বাবা, সে থাকে ভৈরবপুরে— লোকটা বেতালসিদ্ধ। একটি লোকের ছেলে মারা যাচ্ছিল, তার বাপ এসে ধরে পড়তেই লোকটা করলে কী, সেই ছেলেটার প্রাণপুরুষকে একটা নেকড়ে বাঘের মধ্যে চালান করে দিলে। বললে বিশ্বাস করবে না, ছেলেটা মোলো বটে কিন্তু নেকড়েটা আজও দিব্যি বেঁচে আছে। না, হাসছ কী, আমার সম্বন্ধী স্বচক্ষে দেখে এসেছে। সেই নেকড়েটাকে

মারতে গেলে বাপ লাঠি হাতে ছুটে আসে। তাকে দু বেলা ছাগল খাইয়ে লোকটা ফতুর হয়ে গেল। বিদ্যে যদি শিখতে চাও তো সেই সন্ন্যাসীর কাছে যাও।

প্রথম ব্যক্তি

ওরে, চল্ রে, বেলা হয়ে গেল। সন্ন্যাসী-ফন্ন্যাসী সব মিথ্যে। সে কথা আমি তো তখনই বলেছিলেম। আজ-কালকার দিনে কি আর সেরকম যোগবল আছে।

দ্বিতীয় ব্যক্তি

সে তো সত্যি। কিন্তু আমাকে যে কালুর মা বললে, তার ভাগনে নিজের চক্ষে দেখে এসেছে, সন্ন্যাসী এক টান গাঁজা টেনে কল্কেটা যেমনি উপুড় করলে অমনি তার মধ্যে থেকে একভাঁড় মদ আর একটা আস্ত মড়ার মাথার খুলি বেরিয়ে পড়ল!

তৃতীয় ব্যক্তি

বল কী, নিজের চক্ষে দেখেছে!

দ্বিতীয় ব্যক্তি

হাঁ রে, নিজের চক্ষে বইকি।

তৃতীয় ব্যক্তি

আছে রে আছে, সিদ্ধপুরুষ আছে; ভাগ্যে যদি থাকে তবে তো দর্শন পাব। তা চল্-না ভাই, কোন্ দিকে গেল

একবার দেখে আসি গে।

প্রস্থান

সন্ন্যাসী

বালকদের প্রতি

বাবা, আজ যে তোমাদের সব সোনার রঙের কাপড় পরতে হবে!

ছেলেরা

সোনার রঙের কাপড় কেন ঠাকুর।

সন্ন্যাসী

বাইরে যে আজ সোনা ঢেলে দিয়েছে। তারই সঙ্গে আমাদেরও আজ অন্তরে-বাইরে মিলে যেতে হবে তো? নইলে এই শরতের উৎসবে আমরা যোগ দিতে পারব কী করে। আজ এই আলোর সঙ্গে আকাশের সঙ্গে মিলব বলেই তো উৎসব।

ছেলেরা

সোনার রঙের কাপড় কোথায় পাব ঠাকুর।

সন্ন্যাসী

ঐ বেতসিনীর ধার দিয়ে যাও, যেখানে বটতলায় পোড়ো মন্দিরটা আছে সেই মন্দিরটায় সমস্ত সাজানো আছে। ঠাকুরদা, তুমি এদের সাজিয়ে আনো গে!

ঠাকুরদাদা

তবে চলো সবাই।

প্রস্থান

সন্ন্যাসীর গান

রামকেলি। কাওয়ালি

নব কুন্দধবলদল-সুশীতলা,
অতি সুনির্মলা, সুখসমুজ্জ্বলা,
শুভ সুবর্ণ-আসনে অচঞ্চলা।
স্মিত উদয়ারুণ-কিরণ-বিলাসিনী,
পূর্ণসিতাংশু-বিভাস-বিকাশিনী
নন্দনলক্ষ্মী সুমঙ্গলা।

লক্ষেশ্বরের প্রবেশ

লক্ষেশ্বর

দেখো ঠাকুর, তোমার মন্তর যদি ফিরিয়ে না নাও তো ভালো হবে না বলছি। কী মুশকিলেই ফেলেছ, আমার হিসাবের খাতা মাটি হয়ে গেল। একবার মনটা বলে যাই সোনার পদ্মর খোঁজে, আবার বলি থাক্ গে ও-সব বাজে কথা। একবার মনে ভাবি এবার বুঝি তবে ঠাকুরদাই জিতলে বা, আবার ভাবি মরুক গে ঠাকুরদা! ঠাকুর, এ তো ভালো কথা নয়। চেলা-ধরা ব্যাবসা দেখছি তোমার!

কিন্তু সে হবে না, কোনোমতেই হবে না। চুপ করে হাসছ কী। আমি বলছি আমাকে পারবে না— আমার শক্ত হাড়। লক্ষেশ্বর কোনোদিন তোমার চেলাগিরিতে ভিড়বে না।

প্রস্থান

ফুল লইয়া ছেলেদের প্রবেশ

সন্ন্যাসী

এবার অর্ঘ্য সাজানো যাক। এ যে টগর, এই বুঝি মালতী, শেফালিকাও অনেক এনেছ দেখছি! সমস্তই শুভ্র, শুভ্র, শুভ্র! বাবা, এইবার সব দাঁড়াও। একবার পূর্ব-আকাশে দাঁড়িয়ে বেদমন্ত্র পড়ে নিই।

বেদমন্ত্র

অক্ষি দুঃখোত্থিতস্যৈব সুপ্রসন্নে কনীনিকে।
আংক্তে চাদ্‌গণং নাস্তি ঋভূনাং তন্নিবোধত।
কনকাভানি বাসাংসি অহতানি নিবোধত।
অন্নমশ্নীত মৃজ্মীত অহং বো জীবনপ্রদঃ।
এতা বাচঃ প্রযুজ্যন্তে শরদ্‌যত্রোপদৃশ্যতে।

এবারে সকলে মিলে তোমাদের শারদোৎসবের আবাহন-গানটি গাইতে গাইতে বনপথ প্রদক্ষিণ করে এসো। ঠাকুরদা, তুমি গানটি ধরিয়ে দাও। তোমাদের উৎসবের গানে বনলক্ষ্মীদের জাগিয়ে দিতে হবে।

গান

মিশ্র রামকেলি। একতালা

আমরা বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ, আমরা
গেঁথেছি শেফালিমালা।
নবীন ধানের মঞ্জরী দিয়ে
সাজিয়ে এনেছি ডালা।
এসো গো শারদলক্ষ্মী, তোমার
শুভ্র মেঘের রথে,
এসো নির্মল নীল পথে,
এসো ধৌত শ্যামল আলো-ঝলমল
বনগিরি-পর্বতে।
এসো মুকুটে পরিয়া শ্বেত শতদল
শীতল শিশির-ঢালা।
ঝরা মালতীর ফুলে
আসন বিছানো নিভৃত কুঞ্জে
ভরা গঙ্গার কূলে
ফিরিছে মরাল ডানা পাতিবারে
তোমার চরণমূলে।

গুঞ্জরতান তুলিয়ো তোমার
সোনার বীণার তারে

মৃদু মধু ঝংকারে,
হাসিঢালা সুর গলিয়া পড়িবে
ক্ষণিক অশ্রুধারে।
রহিয়া রহিয়া যে পরশমণি
ঝলকে অলককোণে
পলকের তরে সকরুণ করে
বুলায়ো বুলায়ো মনে—
সোনা হয়ে যাবে সকল ভাবনা,
আঁধার হইবে আলা।

সন্ন্যাসী

পৌঁচেছে, তোমাদের গান আজ একেবারে আকাশের পারে গিয়ে পৌঁচেছে। দ্বার খুলেছে তাঁর। দেখতে পাচ্ছ কি, শারদা বেরিয়েছেন। দেখতে পাচ্ছ না! দূরে দূরে, সে অনেক দূরে, বহু বহু দূরে। সেখানে চোখ যে যায় না। সেই জগতের সকল আরম্ভের প্রান্তে, সেই উদয়াচলের প্রথমতম শিখরটির কাছে; যেখানে প্রতিদিন উষার প্রথম পদক্ষেপটি পড়লেও তবু তাঁর আলো চোখে এসে পৌঁছোয় না, অথচ ভোরের অন্ধকারের সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে ওঠে—সেই অনেক অনেক দূরে। সেইখানে হৃদয়টি মেলে দিয়ে স্তব্ধ হয়ে থাকো, ধীরে ধীরে একটু

একটু করে দেখতে পাবে। আমি ততক্ষণ আগমনীর গানটি গাইতে থাকি।

গান

ভৈরবী। একতালা

লেগেছে অমল ধবল পালে
মন্দ মধুর হাওয়া।
দেখি নাই কভু দেখি নাই
এমন তরণী বাওয়া।
কোন্ সাগরের পার হতে আনে
কোন্ সুদূরের ধন!
ভেসে যেতে চায় মন—
ফেলে যেতে চায় এই কিনারায়
সব চাওয়া সব পাওয়া।

পিছনে ঝরিছে ঝরো ঝরো জল,
গুরু গুরু দেয়া ডাকে—
মুখে এসে পড়ে অরুণকিরণ
ছিন্ন মেঘের ফাঁকে।
ওগো কাণ্ডারী, কে গো তুমি, কার
হাসিকান্নার ধন—

ভেবে মরে মোর মন—
কোন্ সুরে আজ বাঁধিবে যন্ত্র,
কী মন্ত্র হবে গাওয়া !

এবারে আর দেখতে পাই নি বলবার জো নেই।

প্রথম বালক

কই ঠাকুর, দেখিয়ে দাও-না।

সন্ন্যাসী

ঐ-যে সাদা মেঘ ভেসে আসছে।

দ্বিতীয় বালক

হাঁ হাঁ, ভেসে আসছে।

তৃতীয় বালক

হাঁ, আমিও দেখেছি।

সন্ন্যাসী

ঐ-যে আকাশ ভরে গেল।

প্রথম বালক

কিসে।

সন্ন্যাসী

কিসে! এই তো স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে আলোতে, আনন্দে। বাতাসে শিশিরের পরশ পাচ্ছ না?

দ্বিতীয় বালক

হাঁ, পাচ্ছি।

সন্ন্যাসী

তবে আর-কি! চক্ষু সার্থক হয়েছে, শরীর পবিত্র হয়েছে, মন প্রশান্ত হয়েছে। এসেছেন, এসেছেন, আমাদের মাঝখানেই এসেছেন। দেখছ না বেতসিনী নদীর ভাবটা! আর, ধানের খেত কী রকম চঞ্চল হয়ে উঠেছে। গাও গাও, ঠাকুরদা, বরণের গানটা গাও।

ঠাকুরদাদার গান

আলেয়া। একতালা

আমার নয়ন-ভুলানো এলে!
আমি কী হেরিলাম হৃদয় মেলে!

সন্ন্যাসী

যাও বাবা, তোমরা সমস্ত বনে বনে নদীর ধারে ধারে গেয়ে এসো গে।

ছেলেদের গাহিতে গাহিতে প্রস্থান

ঠাকুরদাদা

প্রভু, আমি যে একেবারে ডুবে গিয়েছি। ডুবে গিয়ে তোমার এই পায়ের তলাটিতে এসে ঠেকেছি। এখান থেকে আর নড়তে পারব না।

লক্ষেশ্বরের প্রবেশ

ঠাকুরদাদা

এ কী হল! লখা গেরুয়া ধরেছ যে!

লক্ষেশ্বর

সন্ন্যাসীঠাকুর, এবার আর কথা নেই। আমি তোমারই চেলা। এই নাও আমার গজমোতির কৌটো, এই আমার মণিমাণিক্যের পেটিকা তোমারই কাছে রইল। দেখো ঠাকুর, সাবধানে রেখো।

সন্ন্যাসী

তোমার এমন মতি কেন হল লক্ষেশ্বর।

লক্ষেশ্বর

সহজে হয় নি প্রভু। সম্রাট্ বিজয়াদিত্যের সৈন্য আসছে। এবার আমার ঘরে কি আর কিছু থাকবে। তোমার গায়ে তো কেউ হাত দিতে পারবে না, এ সমস্ত তোমার কাছেই রাখলেম। তোমার চেলাকে তুমি রক্ষা করো বাবা, আমি তোমার শরণাগত।

রাজার প্রবেশ

রাজা

সন্ন্যাসীঠাকুর!

সন্ন্যাসী

বোসো, বোসো, তুমি যে হাঁপিয়ে পড়েছ! একটু বিশ্রাম করো।

রাজা

বিশ্রাম করবার সময় নেই। ঠাকুর, চরের মুখে সংবাদ পাওয়া গেল যে, বিজয়াদিত্যের পতাকা দেখা দিয়েছে, তাঁর সৈন্যদল আসছে।

সন্ন্যাসী

বল কী! বোধ হয় শরৎকালের আনন্দে তাঁকে আর ঘরে টিঁকতে দেয় নি। তিনি রাজ্যবিস্তার করতে বেরিয়েছেন।

রাজা

কী সর্বনাশ! রাজ্যবিস্তার করতে বেরিয়েছেন!

সন্ন্যাসী

বাবা, এতে দুঃখিত হলে চলবে কেন। তুমিও তো রাজ্যবিস্তার করবার জন্যে বেরোবার উদ্যোগে ছিলে।

রাজা

না, সে হল স্বতন্ত্র কথা। তাই ব'লে আমার এই রাজ্যটুকুতে— তা সে যাই হোক, আমি তোমার শরণাগত। এই বিপদ হতে আমাকে বাঁচাতেই হবে, বোধ হয় কোনো দুষ্টলোক তাঁর কাছে লাগিয়েছে যে আমি তাঁকে লঙ্ঘন

করতে ইচ্ছা করেছি। তুমি তাঁকে বোলো সে কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা! সর্বৈব মিথ্যা! আমি কি এমনি উন্মত্ত। আমার রাজচক্রবর্তী হবার দরকার কী! আমার শক্তিই-বা এমন কী আছে!

সন্ন্যাসী

ঠাকুরদা!

ঠাকুরদাদা

কী প্রভু।

সন্ন্যাসী

দেখো, আমি কৌপীন প'রে এবং গুটিকতক ছেলেকে মাত্র নিয়ে শারদোৎসব কেমন জমিয়ে তুলেছিলেম, আর ঐ চক্রবর্তী-সম্রাট্‌টা তার সমস্ত সৈন্যসামন্ত নিয়ে এমন দুর্লভ উৎসব কেবল নষ্টই করতে পারে! লোকটা কিরকম দুর্ভাগা দেখেছ!

রাজা

চুপ করো, চুপ করো ঠাকুর! কে আবার কোন্‌ দিক থেকে শুনতে পাবে।

সন্ন্যাসী

ঐ বিজয়াদিত্যের 'পরে আমার—

রাজা

আরে, চুপ চুপ! তুমি সর্বনাশ করবে দেখছি! তাঁর

প্রতি তোমার মনের ভাব যাই থাক্ সে তুমি মনেই রেখে দাও !

সন্ন্যাসী

তোমার সঙ্গে পূর্বেও তো সে বিষয়ে কিছু আলোচনা হয়ে গেছে।

রাজা

কী মুশকিলেই পড়লেম ! সে-সব কথা কেন ঠাকুর, সে এখন থাক্-না।— ওহে লক্ষেশ্বর, তুমি এখানে বসে বসে কী শুনছ ! এখান থেকে যাও-না !

লক্ষেশ্বর

মহারাজ, যাই এমন আমার সাধ্য কি আছে ! একেবারে পাথর দিয়ে চেপে রেখেছে। যমে না নড়ালে আমার আর নড়চড় নেই। নইলে মহারাজের সামনে আমি যে ইচ্ছাসুখে বসে থাকি এমন আমার স্বভাবই নয়।

বিজয়াদিত্যের অমাত্যগণের প্রবেশ

মন্ত্রী

জয় হোক মহারাজাধিরাজচক্রবর্তী বিজয়াদিত্য !

ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম

রাজা

আরে করেন কী, করেন কী ! আমাকে পরিহাস

করছেন নাকি! আমি বিজয়াদিত্য নই। আমি তাঁর চরণাশ্রিত সামন্ত সোমপাল।

মন্ত্রী

মহারাজ, সময় তো অতীত হয়েছে, এক্ষণে রাজধানীতে ফিরে চলুন।

সন্ন্যাসী

ঠাকুরদা, পূর্বেই তো বলেছিলেম পাঠশালা ছেড়ে পালিয়েছি, কিন্তু গুরুমশায় পিছন পিছন তাড়া করেছেন।

ঠাকুরদাদা

প্রভু, এ কী কাণ্ড! আমি তো স্বপ্ন দেখছি নে!

সন্ন্যাসী

স্বপ্ন তুমিই দেখছ কি এঁরাই দেখছেন তা নিশ্চয় ক'রে কে বলবে।

ঠাকুরদাদা

তবে কি—

সন্ন্যাসী

হাঁ, এঁরা কয়জনে আমাকে বিজয়াদিত্য বলেই তো জানেন।

ঠাকুরদাদা

প্রভু, আমিই তো তবে জিতেছি। এই কয় দণ্ডে আমি

তোমার যে পরিচয়টি পেয়েছি তা এঁরা পর্যন্ত পান নি!
কিন্তু, বড়ো সংকটে ফেললে তো ঠাকুর!

লক্ষেশ্বর

আমিও বড়ো সংকটে পড়েছি মহারাজ। আমি সম্রাটের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে সন্ন্যাসীর হাতে ধরা দিয়েছি, এখন আমি যে কার হাতে আছি সেটা ভেবেই পাচ্ছি নে।

রাজা

মহারাজ, দাসকে কি পরীক্ষা করতে বেরিয়েছিলেন।

সন্ন্যাসী

না সোমপাল, আমি নিজের পরীক্ষাতেই বেরিয়েছিলেম।

রাজা

জোড়হস্তে

এই অপরাধীর প্রতি মহারাজের কী বিধান।

সন্ন্যাসী

বিশেষ কিছুই না। তোমার কাছে যে কয়টা বিষয়ে প্রতিশ্রুত আছি সে আমি সেরে দিয়ে যাব।

রাজা

আমার কাছে আবার প্রতিশ্রুত!

সন্ন্যাসী

তার মধ্যে একটা তো উদ্ধার করেছি। বিজয়াদিত্য যে তোমাদের সকলের সমান, সে যে নিতান্ত সাধারণ মানুষ,

সেটা তো ফাঁস হয়েই গেছে। নিজের এই পরিচয়টুকু পাবার জন্যেই রাজতক্ত ছেড়ে সন্ন্যাসী সেজে সকল লোকের মাঝখানে নেবে এসেছিলেম। এখন তোমার একটা কিছু কাজ ক'রে দিয়ে যাব এই প্রতিশ্রুতিটি রক্ষা করতে হবে। বিজয়াদিত্যকে তোমার সভায় আজই হাজির ক'রে দেব— তাকে দিয়ে তোমার কোন্ কাজ করাতে চাও বলো।

রাজা

নতশিরে

তাঁকে দিয়ে আমার অপরাধ মার্জনা করাতে চাই।

সন্ন্যাসী

তা, বেশ কথা। আমাকে যদি সম্রাট্ ব'লে মান তবে আমার সম্বন্ধে তোমার যা কিছু অপরাধ সে রাজ-কার্যেরই ত্রুটি। সেরকম যদি কিছু ঘ'টে থাকে তবে আমি কয়েক দিন তোমার রাজ্যে থেকে সে সমস্তই স্বহস্তে মার্জনা ক'রে দিয়ে যাব।

রাজা

মহারাজ, আপনি যে শরতের বিজয়যাত্রায় বেরিয়েছেন আজ তার পরিচয় পাওয়া গেল। আজ এমন হার আনন্দে হেরেছি, কোনো যুদ্ধে এমনটি ঘটতে পারত না। আমি যে আপনার অধীন এই গৌরবই আমার সকল যুদ্ধজয়ের

চেয়ে বড়ো হয়ে উঠেছে। কী করলে আমি রাজত্ব করবার উপযুক্ত হব সেই উপদেশটি চাই।

সন্ন্যাসী

উপদেশটি কথায় ছোটো, কাজে অত্যন্ত বড়ো। রাজা হতে গেলে সন্ন্যাসী হওয়া চাই।

রাজা

উপদেশটি মনে রাখব, পেরে উঠব ব'লে ভরসা হয় না।

লক্ষেশ্বর

আমাকেও, ঠাকুর— না, না, মহারাজ, ঐরকম একটা কী উপদেশ দিয়েছিলেন, সে আমি পেরে উঠলেম না, বোধ করি মনে রাখতেও পারব না।

সন্ন্যাসী

উপদেশে বোধ করি তোমার বিশেষ প্রয়োজন নেই।

লক্ষেশ্বর

আজ্ঞা, না।

উপনন্দের প্রবেশ

উপনন্দ

ঠাকুর! এ কী, রাজা যে! এরা সব কারা!

পলায়নোদ্যম

সন্ন্যাসী

এসো এসো, বাবা, এসো, কী বলছিলে বলো।

উপনন্দ নিরুত্তর

এঁদের সামনে বলতে লজ্জা করছ? আচ্ছা, তবে সোমপাল একটু অবসর নাও। তোমরাও—

উপনন্দ

সে কী কথা! ইনি যে আমাদের রাজা, এঁর কাছে আমাকে অপরাধী কোরো না। আমি তোমাকে বলতে এসেছিলেম এই ক'দিন পুঁথি লিখে আজ তার পারিশ্রমিক তিন কাহন পেয়েছি। এই দেখো।

সন্ন্যাসী

আমার হাতে দাও বাবা! তুমি ভাবছ এই তোমার বহুমূল্য তিন কার্ষাপণ আমি লক্ষেশ্বরের হাতে ঋণশোধের জন্য দেব? এ আমি নিজে নিলেম। আমি এখানে শারদার উৎসব করেছি, এ আমার তারই দক্ষিণা। কী বলো বাবা!

উপনন্দ

ঠাকুর, তুমি নেবে!

সন্ন্যাসী

নেব বইকি! তুমি ভাবছ সন্ন্যাসী হয়েছি ব'লেই আমার কিছুতে লোভ নেই? এ-সব জিনিসে আমার ভারি লোভ।

লক্ষেশ্বর

সর্বনাশ! তবেই হয়েছে! ডাইনের হাতে পুত্র সমর্পণ ক'রে বসে আছি দেখছি!

সন্ন্যাসী

ওগো শ্রেষ্ঠী!

শ্রেষ্ঠী

আদেশ করুন।

সন্ন্যাসী

এই লোকটিকে হাজার কার্ষাপণ গুণে দাও!

শ্রেষ্ঠী

যে আদেশ।

উপনন্দ

তবে ইনিই কি আমাকে কিনে নিলেন।

সন্ন্যাসী

উনি তোমাকে কিনে নেন ওঁর এমন সাধ্য কী। তুমি আমার!

উপনন্দ

পা জড়াইয়া ধরিয়া

আমি কোন্ পুণ্য করেছিলেম যে আমার এমন ভাগ্য হল!

সন্ন্যাসী

ওগো সুভূতি!

মন্ত্রী

আজ্ঞা !

সন্ন্যাসী

আমার পুত্র নেই ব'লে তোমরা সর্বদা আক্ষেপ করতে। এবারে সন্ন্যাসধর্মের জোরে এই পুত্রটি লাভ করেছি।

লক্ষেশ্বর

হায় হায়, আমার বয়স বেশি হয়ে গেছে ব'লে কী সুযোগটাই পেরিয়ে গেল !

মন্ত্রী

বড়ো আনন্দ ! তা, ইনি কোন্ রাজগৃহে—

সন্ন্যাসী

ইনি যে গৃহে জন্মেছেন সে গৃহে জগতের অনেক বড়ো বড়ো বীর জন্মগ্রহণ করেছেন— পুরাণ ইতিহাস খুঁজে সে আমি তোমাকে পরে দেখিয়ে দেব। লক্ষেশ্বর !

লক্ষেশ্বর

কী আদেশ।

সন্ন্যাসী

বিজয়াদিত্যের হাত থেকে তোমার মণিমাণিক্য আমি রক্ষা করেছি, এই তোমাকে ফিরে দিলেম।

লক্ষেশ্বর

মহারাজ, যদি গোপনে ফিরিয়ে দিতেন তা হলেই যথার্থ রক্ষা করতেন, এখন রক্ষা করে কে !

সন্ন্যাসী

এখন বিজয়াদিত্য স্বয়ং রক্ষা করবেন, তোমার ভয় নেই। কিন্তু, তোমার কাছে আমার কিছু প্রাপ্য আছে।

লক্ষেশ্বর

সর্বনাশ করলে !

সন্ন্যাসী

ঠাকুরদা সাক্ষী আছেন।

লক্ষেশ্বর

এখন সকলেই মিথ্যে সাক্ষ্য দেবে।

সন্ন্যাসী

আমাকে ভিক্ষা দিতে চেয়েছিলে। তোমার কাছে এক মুঠো চাল পাওনা আছে। রাজার মুষ্টি কি ভরাতে পারবে।

লক্ষেশ্বর

মহারাজ, আমি সন্ন্যাসীর মুষ্টি দেখেই কথাটা পেড়েছিলেম।

সন্ন্যাসী

তবে তোমার ভয় নেই, যাও।

লক্ষেশ্বর

মহারাজ, ইচ্ছে করেন যদি তবে এইবার কিছু উপদেশ দিতে পারেন।

সন্ন্যাসী

এখনো দেরি আছে।

লক্ষেশ্বর

তবে প্রণাম হই। চার দিকে সকলেই কৌটোটার দিকে বড্ড তাকাচ্ছে।

প্রস্থান

সন্ন্যাসী

রাজা সোমপাল, তোমার কাছে আমার একটি প্রার্থনা আছে।

রাজা

সে কী কথা! সমস্তই মহারাজের, যে আদেশ করবেন—

সন্ন্যাসী

তোমার রাজ্য থেকে আমি একটি বন্দী নিয়ে যেতে চাই।

রাজা

যাকে ইচ্ছা নাম করুন, সৈন্য পাঠিয়ে দিচ্ছি। না হয় আমি নিজেই যাব।

সন্ন্যাসী

বেশি দূরে পাঠাতে হবে না।

ঠাকুরদাদাকে দেখাইয়া

তোমার এই প্রজাটিকে চাই।

রাজা

কেবলমাত্র এঁকে! মহারাজ যদি ইচ্ছা করেন তবে আমার রাজ্যে যে শ্রুতিধর স্মৃতিভূষণ আছেন তাঁকে আপনার সভায় নিয়ে যেতে পারেন।

সন্ন্যাসী

না, অত বড়ো লোককে নিয়ে আমার সুবিধা হবে না, আমি এঁকেই চাই। আমার প্রাসাদে অনেক জিনিস আছে, কেবল বয়স্য নেই।

ঠাকুরদাদা

বয়সে মিলবে না প্রভু, গুণেও না; তবে কিনা ভক্তি দিয়ে সমস্ত অমিল ভরিয়ে তুলতে পারব এই ভরসা আছে।

সন্ন্যাসী

ঠাকুরদা, সময় খারাপ হলে বন্ধুরা পালায়, তাই তো দেখছি! আমার উৎসবের বন্ধুরা এখন সব কোথায়! রাজদ্বারের গন্ধ পেয়েই দৌড় দিয়েছে নাকি!

ঠাকুরদাদা

কারও পালাবার পথ কি রেখেছ। আটঘাট ঘিরে

ফেলেছ যে। ঐ আসছে।

বালকগণের প্রবেশ

সকলে

সন্ন্যাসীঠাকুর, সন্ন্যাসীঠাকুর!

সন্ন্যাসী

উঠিয়া দাঁড়াইয়া

এসো বাবা, সব এসো!

সকলে

এ কী! এ যে রাজা! আরে, পালা! পালা!

পলায়নোদ্যম

ঠাকুরদাদা

আরে, পালাস নে! পালাস নে!

সন্ন্যাসী

তোমরা পালাবে কী, উনিই পালাচ্ছেন। যাও সোমপাল, সভা প্রস্তুত করো গে, আমি যাচ্ছি।

রাজা

যে আদেশ।

প্রস্থান

বালকেরা

আমরা বনে পথে সব জায়গায় গেয়ে গেয়ে এসেছি, এইবার এখানে গান শেষ করি।

ঠাকুরদাদা

হাঁ ভাই, তোরা ঠাকুরকে প্রদক্ষিণ ক'রে ক'রে গান গা।

সকলের গান

আলেয়া। একতালা

আমার নয়ন-ভুলানো এলে!
আমি কী হেরিলাম হৃদয় মেলে!
শিউলিতলার পাশে পাশে
ঝরা ফুলের রাশে রাশে
শিশির-ভেজা ঘাসে ঘাসে
অরুণ-রাঙা চরণ ফেলে
নয়ন-ভুলানো এলে!

আলোছায়ার আঁচলখানি
লুটিয়ে পড়ে বনে বনে,
ফুলগুলি ঐ মুখে চেয়ে
কী কথা কয় মনে মনে।
তোমায় মোরা করব বরণ,
মুখের ঢাকা করো হরণ—
ওইটুকু ওই মেঘাবরণ
দু হাত দিয়ে ফেলো ঠেলে!
নয়ন-ভুলানো এলে!

বনদেবীর দ্বারে দ্বারে
শুনি গভীর শঙ্খধ্বনি,
আকাশবীণার তারে তারে
জাগে তোমার আগমনী।
কোথায় সোনার নূপুর বাজে—
বুঝি আমার হিয়ার মাঝে
সকল ভাবে সকল কাজে
পাষাণ-গলা সুধা ঢেলে!
নয়ন-ভুলানো এলে!

৭ ভাদ্র ১৩১৫